দ্য রোড টু
আল-কায়েদা
বিন লাদেনের ডান হাতের গল্প
মুনতাসির আল-যায়াত
রূপান্তর
বিনতে আব্দুল্লাহ
প্রচ্ছদ

মুনতাসির আল-যায়াত

মুনতাসির আল-যায়াতের জন্ম ১৯৫৬ সালে মিশরে। বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা সেখানেই। পেশায় তিনি একজন আইনজীবী। পাশাপাশি ইসলামি আন্দোলন ও মুসলিম কেন্দ্রিক বিষয়গুলোতে একজন সক্রিয় ব্যক্তি। ২১ বছর বয়সে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে শতশত মিশরীয় যুবকের মতো তাকেও গ্রেফতার করা হয়। নিরপরাধ হওয়ার পরও তিন বছর কারাভোগ করতে হয় তাকে। আয়মান আল-জাওয়াহিরির সাথে মুনতাসির যায়াতের সাক্ষাৎ হয় কারাগারেই। পরবর্তীতে জাওয়াহিরির সমালোচনা করে "দ্য রোড টু আল-কায়েদা" নামে একটি বই লেখেন মুনতাসির আল-যায়াত। একজন সক্রিয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব হওয়ায়, বিভিন্ন ইসলামি দলের উত্থান, কার্যক্রম, প্রভাব—এসব বৈচিত্র্যময় বিষয়ে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আর এ কারণে গবেষক, সাংবাদিক ও আগ্রহী পাঠকদের কাছে ইসলামি আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে তিনি পরিচিত।

দ্য রোড টু আল-কায়েদা

মুনতাসির আল-যায়াত

দ্য রোড টু আল-কায়েদা

মুনতাসির আল-যায়াত

রূপান্তর

বিনতে আব্দুল্লাহ

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

www.projonmo.pub

দ্য রোড টু আল-কায়েদা

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২০

২য় সংস্করণ : বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, ২৮ হেমেন্দ্র দাস লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

The road to al-Qaeda by Montasser al-Zayyat, transformed by Binte Abdullah

Published by Projonmo Publication

ISBN: 978-984-94392-9-5

সূচীপত্র

সিরিজের ভূমিকা ৭

মুখবন্ধ ৯

যে আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে আমি চিনতাম ২৩

একজন অভিজাত মৌলবাদী ৪৩

জাওয়াহিরির দলের সদস্য ৪৮

সাদাত হত্যাকাণ্ডের আগে বিভিন্ন দল ৫১

সাদাত হত্যা ৫৪

যাদের মাধ্যমে জাওয়াহিরি প্রভাবিত হয়েছেন ৫৯

সাদাত হত্যার ফলাফল ৬৫

জামআ আল-ইসলামিয়া ৭০

বাহির থেকে দল পুনর্গঠনের চেষ্টা ৭১

জাওয়াহিরির ভিশন ৭৩

জাওয়াহিরির জবানবন্দী ৭৭

আফগানিস্তান: জিহাদের ভূমি ৯৪

আফগানিস্তানে আল-কায়েদা ১০০

আফগানিস্তানের বাইরে ১০৪

ইয়েমেন ও সুদান: সাময়িক অবস্থা ১০৬

আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন ১১০

জাওয়াহিরির মতবাদের পরিবর্তন: দূরের এবং কাছের শত্রু ১১২

জাওয়াহিরির পন্থায় পরিবর্তন আসার কারণ ১১৮

জামাআ আল-ইসলামিয়ার অস্ত্রবিরতি উদ্যোগ ১২৮

জাওয়াহিরির দাবির বিপক্ষে আমার জবাব ১৫০

জাওয়াহিরির ভুলের মাশুল অন্য ইসলামিস্টদের দিতে হয়েছিল ১৫৩

জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের প্রভাব ১৫৭

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হামলার প্রভাব ১৫৯

একটি ছেলের মৃত্যদণ্ড ও একজন দলীয় নেতা হত্যা ১৬৮

একটি ছেলের ফাঁসি ১৭১

আবু খাদিজা হত্যা ১৭৪

পদত্যাগ খেলা ১৭৮

সংগ্রাম চলছেই ১৮০

টিকা ১৯৬

.... ১১০
.... ১১২
.... ১১৮
.... ১২৮
.... ১৫০
.... ১৫৩
.... ১৫৭
.... ১৫৯
.... ১৬৮
.... ১৭১
.... ১৭৪
.... ১৭৮
.... ১৮০
.... ১৯৬

সিরিজের ভূমিকা

ইসলাম একটি জটিল এবং বহুমুখী বিষয়। সাধারণত মুসলিমদের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতে ইসলাম শব্দটা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি পরিচয় ও নিয়মশৃঙ্খলার অত্যাধুনিক-অপরিবর্তনীয় ধারণার সাথেও জড়িত। মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতিগত-সংস্কৃতিগত ভিন্নতা, বিকাশের ভিন্নতা; আবার তাদের উপনিবেশিক ইতিহাস এবং উপনিবেশ-পরবর্তী বর্তমান অবস্থা ইসলামকে একটি বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত করেছে।

ক্রিটিক্যাল স্টাডিজ অন ইসলাম সিরিজটি ইসলাম সম্পর্কে একটি সুদূরপ্রসারী ও পর্যালোচনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে। সিরিজটি এমন মানুষদের দৃষ্টিতে ইসলামের বৈচিত্র্য এবং জটিলতা ব্যাখ্যা করে যারা ইসলামেরই অংশ। এটি এমন একটি উদীপ্ত এবং চিন্তাশীল কাজ যেটা নবিন অথবা পণ্ডিত উভয়কেই বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন, মুসলিম হিসেবে সম্মুখীন হওয়া নানারকম প্রশ্ন, বিজাতীয় ইসলামি রাজনৈতিক ঝোঁক, জাতিগত দ্বন্দ্বের অপচ্ছায়া, মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং পশ্চিমা মুসলিমদের নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহ জোগাবে।

এই সিরিজটি দুটি মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। মুসলিমরা ইসলামে থেকে ইসলাম নিয়ে কী ভাবে? এবং বর্তমান বিশ্বের এজেন্ডা অনুযায়ী কীভাবে তারা পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে ইসলামের সংস্কার এবং রূপান্তর ঘটাতে চায়?

ইসলাম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাপূর্ণ গবেষণা হওয়ায় এটি প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারা—এ বিষয় দুটির মধ্যে থাকা শূন্যস্থান পূরণ করতে চেয়েছে। আশা করা যায় নীতি নির্ধারক, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিক, সক্রিয় কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের জন্য এটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ড. আযযা কারাম নিউইয়র্কে অবস্থিত the World Conference of Religions for Peace (WCRP) এর আন্তর্জাতিক সচিবালয়ে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। তিনি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় এনজিওতে পরামর্শদাতা এবং প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংঘাত, ইসলাম, মধ্যপূর্ব অঞ্চল ও উঠতি রাজনীতি নিয়ে তিনি বিভিন্ন লেকচার এবং বই প্রকাশ করেছেন। তার বইগুলো হলো—Women, Islamisms and State: Contemporary Feminisms in Egypt (1998), A Woman's Place: Religious Women as Public Actors (ed.) (2002) and Transnational Political Islam: Religion, Ideology and Power (2003). জিয়াউদ্দিন সরদার একজন সুপরিচিত লেখক, ব্রডকাস্টার এবং সংস্কৃতি পর্যালোচক। সমসাময়িক কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনাকারী পত্রিকা Thrid Text এর সম্পাদক তিনি। তাকে ইসলামি লেখালেখির অগ্রদূত মনে করা হয়। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন। যেমন—Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader, edited by Sohail Inayatullah and Gail Boxwell.

মুখবন্ধ

মুনতাসির আল-যায়াতের লেখা 'দ্য রোড টু আল-কায়েদা' আয়মান আল-জাওয়াহিরির পর্যালোচনামূলক জীবনী, আল-কায়েদা নামক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলনের রহস্য উদঘাটনের জন্য শক্তিশালী সহায়ক। জাওয়াহিরি বর্তমানে মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের একজন। ওসামা বিন লাদেনের পর সে আল-কায়েদার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। কিছু বিশেষজ্ঞ তাকে আল-কায়েদার মস্তিষ্ক বলে মনে করেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে একজন মিশরীয় এমন একটি ভূমিকা পালন করছেন। মিশরের ইতিহাসে শক্তিশালী আধুনিক সভ্যতা এবং হিংস্র দমন-পীড়ন দুটোরই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মিশরে অসংখ্য ইসলামিস্ট আছেন যাদের ক্ষমতাসীনদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

যায়াতের লেখাতে আয়মান আল-জাওয়াহিরির মনস্তাত্ত্বিক জীবনীই শুধু নয়, উঠে এসেছে মিশরীয় ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসও। আল-কায়েদার সৃষ্টিতেও কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং, এই বইটি আল-কায়েদার সূচনা, গঠন, কলাকৌশল এবং একবিংশ শতাব্দীতে সামনে তাদের কাছ থেকে কী আশা করা যায় সে সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে।

১৯৭৫ সালের দিকে মিশরীয় ইসলামিক আন্দোলনের সময়ে যখন এই আন্দোলন যুবসমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল তখন মুনতাসির আল-যায়াত এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে মিশরীয় শাসক আনোয়ার আল-সাদাত হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার হন তিনি। সেসময় কারাগারে অবস্থানকালে আয়মান আল-জাওয়াহিরির সাথে তার প্রথম দেখা হয়।

আয়মান আল-জাওয়াহিরির লেখা *Knights Under the Banner of the Prophet* বইটি প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে যায়াতের ঐতিহাসিক এই বইটির সূচনা ঘটে। আমেরিকা যখন আফগানিস্তানকে অবরুদ্ধ করে

রেখেছিল তখন জাওয়াহিরি তোরাবোরার কোনো এক গুহায় বসে ঐ বইটি লিখেছিল। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে বইটি প্রকাশিত হয়। জাওয়াহিরি তার বইয়ে আদর্শিক কথাবার্তা এবং যায়াতসহ অনেকের সমালোচনা করেছিল। যায়াত অনেকবার সেসব অভিযোগের কথা তার লেখায় এনেছেন।

জাওয়াহিরির অভিযোগের উত্তরে যায়াত ২০০২ সালে যে বইটি লিখেছিলেন, মিশরীয় অনেক নেতা সেটার সমালোচনা করেন। যদিও যায়াত জোর দিয়ে বলেন, সেটা বিরোধিতা করে লেখা হয়নি বরং তার অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণে লেখা হয়েছে; তারপরও কিছু ইসলামিস্ট সেই বই প্রকাশের সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কারণ সেসময় আমেরিকা আফগানিস্তানকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মিশরীয় ইসলামিস্টরা আমেরিকার এই কাজকে অন্যায়, অমানবিক নিষ্ঠুর কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাদের আশঙ্কা ছিল এই বই আমেরিকার আগ্রাসনকে ন্যায্যতা দেবে। সেজন্য পরবর্তীতে যায়াত জাওয়াহিরির প্রতিউত্তরে লেখা আরবি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেননি।

সেই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ এমন সময় বাজারে আনা হয় যখন আয়মান আল-জাওয়াহিরি আল-কায়েদার ডিপুটি হেড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে জাওয়াহিরি যায়াতের সংগঠন The Future Center for Studies এর ওয়েবসাইটে একটি ইমেইল পাঠায়। সেই ইমেইলে জাওয়াহিরি ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার প্রশংসা করে এবং বলে এমন হামলা চলতে থাকবে। Cairo Times পত্রিকা একে 'Cyber Call' নামে অভিহিত করেছে।

জাওয়াহিরির সাথে যায়াতের পূর্বেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং যোগাযোগের কারণে তার লেখা জাওয়াহিরির মনস্তাত্ত্বিক জীবনী শুধু পৃথিবীর একজন মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি সম্পর্কেই ধারণা দেয় না, সাথে যুদ্ধরত ইসলামিক দলগুলোর রূপ, আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তিদের নিশানা বানানোর ঝোঁক সম্পর্কেও ধারণা দেয়।

যায়াত মিশরীয় ইসলামিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাই মিশরের ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠক-গবেষকদের

জন্য যায়াতের লেখা বইটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে। দমন-পীড়নমূলক রাজনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন দলের উত্থান, কার্যক্রম, প্রভাব—এসব বৈচিত্র্যময় বিষয় অভিজ্ঞ গবেষকদেরও বিভ্রান্ত করে। যায়াত যেহেতু একজন অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি, এসব আন্দোলন গভীরভাবে জানার ক্ষেত্রে পশ্চিমা শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকদের জন্য তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ইসলামিজম

ইসলামের বেশ কিছু ধরন, শাখা এবং উপদল রয়েছে। একেক দলের কাছে 'সত্যিকারের' ইসলামের ধারণা একেক রকম। মুসলিমদের মুষ্টিমেয় একটি অংশ ও আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তারা যে মতবাদ এনেছেন, তাকে ইসলামিজম বলা যায়।

মোটাদাগে তাদের এই রাজনৈতিক দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় প্রশাসনিক কাজে ইসলামি নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা বা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হিসেবে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন দলের মাঝে শুধু আদর্শ ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কেমন হবে এই নিয়ে গঠনপ্রকৃতিগত মতপার্থক্যই নয়, কীভাবে এটি অর্জন করা যাবে সে বিষয় নিয়েও মতপার্থক্য আছে। অবশ্য কিছু মতামতের মিল আছে আর এগুলোই তাদের সাধারণ মুসলিম এমনকি মূলধারার ইসলামিস্টদের থেকেও আলাদা করেছে। ইসলামি ইতিহাসে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তার কয়েকজন সাহাবি (যারা তার পর শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন) ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা এবং অর্থনৈতিক নেতা। সে অনুসারে ইসলামি শাসনব্যবস্থা হচ্ছে এমন নেতৃত্ব যা ঐশ্বরিক ফয়সালা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। সেই নেতৃত্ব সমৃদ্ধি ও উদারতা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতা) সময় আরব উপদ্বীপে চলতে থাকা যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষ্ঠুরতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছিল। তাই একটি বিষয়ে ইসলামিস্টরা একমত যে, ইসলাম শুধু

জীবনধারণের পদ্ধতি নয় বরং নেতৃত্ব, রাজনীতি এবং অর্থনীতিরও পদ্ধতি। ইসলামিস্টরা মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের মাঝে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকভাবেই ইসলামিস্টরা আরও মনে করে, একমাত্র ইসলামিক শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইহকাল-পরকালে উন্নতি এবং শান্তি অর্জন করা সম্ভব। উপনিবেশিক যুগ এবং উপনিবেশ-পরবর্তী যুগে মুসলিম বিশ্বের সামরিক দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ হিসেবে অনেক ইসলামিস্ট, এমনকি অনেক সাধারণ জনগণও ইসলামি শরিয়াহ না মেনে পশ্চিমা নেতৃত্ব মেনে নেওয়াকে দায়ি মনে করে। ধর্মের মাধ্যমে সুষ্ঠু রাজনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করে ইতিহাসে বারবার ইসলামকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ইসলামিস্টদের বিশ্বাস, সরকার পরিচালিত হবে নবির দেখানো ব্যবস্থা অনুযায়ী। সে কারণে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করা বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ইসলামিস্টদের পছন্দ নয়। আমেরিকার বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়ার সবচেয়ে উদ্ধৃত উদাহরণ হলো ইসরায়েল অধীনস্থ ফিলিস্তিন অঞ্চল। আরব টেলিভিশন সংবাদগুলোতে প্রতিনিয়ত ইসরায়েল সৈন্যদের দ্বারা নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মহিলা ও শিশুর ছবি দেখা যায়।

বেশিরভাগ মুসলিমই স্বীকার করবে যে পশ্চিমা কর্তৃত্ব আরব দেশগুলোতে দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ইসলামিস্টদের সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা করা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও সঠিক প্রতিক্রিয়ার জন্য। আরব বিশ্বের রাজনৈতিক অবনতির বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে মিশরীয় মুসলিমদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: মূলধারার মুসলিম, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দাওয়াহর প্রসার ঘটানোকে প্রধান উপায় মনে করে এমন ইসলামিস্ট, জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী মুসলিম।

পূর্বে উল্লেখিত মূলধারার মুসলিমরা সাধারণত আমেরিকান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ইসলামিস্টরা যেসব অভিযোগ করে সেগুলোর সাথে একমত পোষণ করে। তবে তারা ইসলামিস্টদের মতো সরাসরি ক্ষমতাধরদের মোকাবিলা করা এড়িয়ে চলে বা এড়িয়ে চলাকেই ঠিক

মনে করে। বিশ্ব রাজনৈতিক শক্তির কাছে নিজেদের দুর্বল মনে করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই তাদের কাছে পছন্দনীয়। তাছাড়া, সশস্ত্র সংগ্রামের বিষয়ে মূলধারার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হলো—সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হারাম বা ইসলামে নিষিদ্ধ। আরও একটি কারণ হলো—অনেক মুসলিম মনে করে, আমেরিকান নাগরিকরা তাদের সরকারের কুকর্ম বা অপরাধের জন্য সরাসরি দায়ি নয়। এমনকি যারা আমেরিকান নাগরিকদের তাদের দেশের বৈদেশিক নীতির কারণে দোষী মনে করে তারাও একমত পোষণ করে যে, যেকোনো পরিস্থিতিতেই সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করা নিষিদ্ধ।

প্রকাশ্য রাষ্ট্রে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা ও রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার বিষয়গুলো ইসলামিস্টদের মূলধারার মুসলিমদের থেকে আলাদা করেছে। যেসব ইসলামিস্ট দাওয়াহ পন্থায় বিশ্বাসী, তারা সাধারণত সমাজের গোড়া বা সাধারণ জনগণের পরিবর্তনের সূত্রপাত আশা করে। দাওয়াহ শব্দের আভিধানিক অর্থ আহ্বান করা। দাওয়াহ বলতে মুসলিম কর্তৃক অন্যদের সঠিক পথে বা পরিপূর্ণ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার আহ্বান করা বুঝায়। নিজের ও সমাজের পরিবর্তন—এই ইসলামি নীতির ওপর নির্ভর করে দাওয়াহপন্থি ইসলামিস্টরা সুন্দর জীবনযাপনের দিকে ডাকে। আর সমাজের বিরাট অংশকে ধার্মিক বানিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশায় সমাজে তাদের চিন্তাধারা প্রচার করে। সমসাময়িক মিশরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' দাওয়াহ পন্থা অনুসরণকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম, যদিও তাদের আরও কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সংসদে আসন অর্জন করে সরকারি নীতিনির্ধারণীতে প্রভাব ফেলার জন্য এই দলের অনেক সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে (মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড দলটি নিষিদ্ধ)। দাওয়াহ পন্থা অবলম্বনকারী ইসলামিস্টরা এ বিষয়ে একমত যে, সাধারণ জনগণ বা যেকোনো জাতি-ধর্মের সাধারণ জনগণের ওপর আক্রমণ করা হারাম বা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ইসলামি আন্দোলনে সামাজিক পরিবর্তনে সশস্ত্রপন্থা সমর্থনকারী জিহাদিরা সংখ্যালঘু। তারা একদম উপর থেকে সামাজিক পরিবর্তন করতে চায়। আর এটা করতে চায় সেসকল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা রাজনৈতিকভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে ভালো কাজ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাধারণত পশ্চিমা কর্তৃত্ব দূর করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলামি শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য। শুরুর দিকে জিহাদি দলগুলো আধুনিকায়ন চাওয়া কোনো সামরিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা ব্যক্তিকে টার্গেট করত, সাধারণ জনগণকে নয়। আগে তাদের টার্গেট হতো প্রাচ্যে পশ্চিমাকরণ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু বর্তমানে সরাসরি পশ্চিমা শক্তির কেন্দ্র তাদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে। জাওয়াহিরির মিশরীয় ইসলামি জিহাদ বা জামাআ আল-ইসলামিয়ার মতো জিহাদি দলগুলো সেনাকর্মকর্তা ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে হামলা করে জিহাদি ইসলামিস্টদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। তবু এই দলগুলোর মাঝেও জনগণের ওপর হামলার করার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ কাজ।

এই অধ্যায়ে দেখানো হবে, কীভাবে ভুলক্রমে বা পরিকল্পিতভাবে মিশরীয় জনগণ দেশের বা বিদেশের এই হামলাগুলোয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল আর জিহাদি দলগুলোর জনপ্রিয়তা কমছিল। জামাআ আল-ইসলামিয়া পরিচালিত 'লাক্সর হামলা' দলটির অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণ হয়, যা শেষ পর্যন্ত তাদের যুদ্ধবিরতি উদ্যোগে গিয়ে পৌঁছে। উদ্যোগে যায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তবু এই বিষয়ে জিহাদি দলগুলোর মাঝেও বিতর্ক-বিবাদ চালু রয়েছে। দলের ভেতর মতাদর্শের বিভক্তি হারাম বা নিষিদ্ধ—জিহাদি ইসলামিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গি জিহাদি দল ভাঙার বা ছোট ছোট উপদল সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনগণ বা পশ্চিমাদের টার্গেট বানানোর ক্ষেত্রে ওসামা বিন লাদেন ও তার দল আল-কায়েদা অন্য জিহাদি ইসলামিস্টদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানে নিয়ে গেছে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে যেকোনো স্থানে আমেরিকানদের হামলা করার বিষয়ে বিন লাদেন একটি ফতোয়া বা ধর্মীয় রায় প্রকাশ করে, যাতে সকল মুসলিম তা মানতে বাধ্য হয়

(ফতোয়াটি *'আল-কুদস আল-আরাবি'* নামে আরবিতে প্রকাশিত হয়েছে)। সে তার মতের পক্ষে যুক্তি দেয়, আমেরিকান বা অন্য দেশের নাগরিকরা ট্যাক্স দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সরকারের নীতি-নির্ধারণীতে ও মুসলিমদের ওপর চালিত গণহত্যায় সমর্থন করে। এ কারণে জনগণকেও সরকারের সহযোদ্ধা হিসেবে ধরা হবে। সম্ভবত, আল-কায়েদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে জিহাদি দলগুলোর মাঝে বিদ্যমান বিভাজনকে মানিয়ে নেওয়া এবং নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন দলকে যুক্ত করার মাধ্যমে জিহাদি আন্দোলনকে বৈশ্বিক রূপ দান করা।

আল-কায়েদার অনন্য বৈশিষ্টগুলো পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির ক্রমবৃদ্ধি

যায়াত ড. জাওয়াহিরির চিন্তাধারা ও পন্থার বিভিন্ন বাঁকের কথা বলেছেন। মিলিটারি ইসলামের বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। যায়াত মিশরের সক্রিয় অ্যাক্টিভিস্ট সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যু জাওয়াহিরির ও মিশরের অন্যান্য বিপ্লবকামী যুবকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সাইয়েদ কুতুব তার *মাইলস্টোন* বইটির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সেখানে তিনি আধুনিক মুসলিম সরকার ব্যবস্থাকে জাহেলিয়া বা অমুসলিম হওয়ার মতো অজ্ঞতার সাথে তুলনা করেছেন। তার মতে, আধুনিক বিধি-বিধান ও মতবাদ নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এগুলোকে ছুড়ে ফেলে এর বদলে ইসলামি শরিয়াহকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক মতবাদের বদলে সম্পূর্ণরূপে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৬৬ সালের ২৯ অগাস্ট, নাসের সরকার কুতুবকে তার মতবাদের কারণে ফাঁসি দিলে অনেক যুবকের মতো জাওয়াহিরিও ইসলামিজমের দিকে আকৃষ্ট হয়। সমসাময়িক সময়ে প্রতিষ্ঠিত অনেক দলের

ইসলামিস্টদেরই সাইয়েদ কুতুবের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে দেখা যায়।

সাদাত হত্যাকে কেন্দ্র করে বন্দী হওয়ার পর জাওয়াহিরির ওপর চালিত ভয়ানক অত্যাচারের কথাও যায়াত বর্ণনা করেছেন। জাওয়াহিরির জন্য এই অত্যাচার ছিল জীবন ধ্বংসকারী অত্যাচার। যায়াতের মতে, এই অত্যাচারের কারণে জাওয়াহিরি মিশর ছেড়ে সৌদি আরবে যেতে বাধ্য হয়। সৌদি আরবে যাওয়ার আগে সে ছিল স্বল্পভাষী, ভদ্র ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যেগুলো বলে দেয়—জাওয়াহিরির মৌলবাদী মনোভাব—যার কারণে আজ সে পুরো বিশ্বের চোখে অপরাধী, এই মনোভাব তৈরি হয়েছে কারাগারে মিশর সরকারকর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার মাধ্যমে। মিশরীয় প্রশাসনের কাছে অত্যাচার-নির্যাতন বরাবরই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সন্দেহভাজনের কাছ থেকে পরিকল্পিত আক্রমণসহ অন্যান্য বিষয়ে তথ্য আদায়ের জন্য নির্যাতন কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে তাদের কাছে পরিচিত। ২০০৩ সালের ২৪ জানুয়ারি গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক মানবাধিকার কর্মী অমানবিকতা ও মানসিক অত্যাচারের সাথে সশস্ত্র রাজনীতির যোগসূত্র পেয়েছেন।

যায়াতের বক্তব্যটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ সশস্ত্র কাজকর্মের—বিশেষত ইসলামি আন্দোলনের সশস্ত্র ঘটনাগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় অত্যাচারের বিষয়গুলো সূত্র হিসেবে কাজ করে।

যায়াতের বর্ণনায় জাওয়াহিরির মতাদর্শে আরেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক ও মিলিটারি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্থানীয় সরকারের পরিবর্তে বহিঃবিশ্বের, বলতে গেলে বিশ্বের প্রধান শক্তিধর ওয়াশিংটনের দিকে সরে যায়। কয়েক দশক আগে অসংখ্য ইসলামি দল জাওয়াহিরির ভাষায় 'নিকট শত্রু' এর বিরুদ্ধে লড়ছিল। 'নিকট শত্রু' বলতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সেসব প্রশাসনকে বুঝায়, যারা ইসলামি আইনের পরিবর্তে পশ্চিমা বিধি-বিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে। জাওয়াহিরির পরিবর্তিত মানসিকতা অনেক ইসলামিস্ট গ্রহণ করেনি।

বিশেষ করে পশ্চিমে বসবাসকারী ও পশ্চিমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা ইসলামিস্টরা। তার অধিকাংশ নীতিমালা জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় বলে মনে হয়।

এটা মনে হচ্ছিল যে, মুসলিম ভূমি থেকে বিদেশি কর্তৃত্ব দূর করা, প্রাচ্যে বিদেশিদের মুখপাত্রদের উৎখাত করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। জাওয়াহিরির পরিভাষায় এই কর্তৃত্ব দেখানো দেশগুলোকে 'দূর শত্রু' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। 'দূর শত্রু' মানে সেসব অমুসলিম দেশ, যারা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপকৃত হচ্ছে। জাওয়াহিরির এই আন্দোলনে শরিক হওয়ার প্রথম দিনগুলোতে তৎকালীন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, বহিঃবিশ্বের রাজনীতিতে প্রভাব খাটানো অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পৃথিবীর দুই সুপারপাওয়ারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা সম্ভব নয়। তবে ১৯৯৮ সালে বিন লাদেন ও জাওয়াহিরির একতায় ইহুদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গঠিত *আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদ* দলে আঞ্চলিকের চেয়ে বৈশ্বিক শত্রুর দিকে বেশি জোর দেওয়া হয় এবং আমেরিকা ও এর মিত্রদের সাথে শত্রুতার কথা সরাসরি ঘোষণা করা হয়। ফলে জাওয়াহিরিও 'দূর শত্রু'কে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে।

যায়াত জাওয়াহিরির চিন্তাধারাকে বিন লাদেনের সাথে বন্ধুত্বের ফলাফল হিসেবে দেখে। ইতোমধ্যে আটলান্টিক জুড়ে বিন লাদেনের শত্রু তৈরি হয়েছিল। বিন লাদেনের সাথে তালিবানের সুসম্পর্ক, বিশেষ করে আর্থিক জোগানের কারণে জাওয়াহিরির বিন লাদেনের সাথে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এর বিনিময়ে সে বিন লাদেনের আদর্শিক চিন্তাধারা গ্রহণ করে নেয়।

এই ক্রমবিকাশ পুরো বিশ্বের জিহাদি ইসলামিস্টদের মাঝে সমান্তরাল পরিবর্তন সূচিত করে। আমেরিকার পতন ঘটানোর ধৃষ্টতা বা দৃঢ়বিশ্বাস, বৈশ্বিক জিহাদ পরিচালনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানোর মাধ্যমে।

কয়েক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের সময় আরব মুসলিমরা (সাধারণত মিশর, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও

আলজেরিয়া থেকে) আফগানিস্তানে গিয়েছিল নাস্তিক সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এই অভিবাসী যোদ্ধাদের আরব আফগান বা মুজাহিদীন (জিহাদ-যোদ্ধা) বলা হয়। সেসময় আমেরিকা এদের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। কারণ, তখন রাশিয়া তাদের দুজনেরই শত্রু ছিল। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জয়কে মুজাহিদীনরা আধুনিক অর্থনীতি-সেনাবাহিনী ও আধুনিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে জয় হিসেবে দেখত। প্রকৃতপক্ষে, আরব আফগানদের কাছে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের যুদ্ধ, সোভিয়েত দানবের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ছোট্ট একটি দলের জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এই বিজয়ই আরব-আফগানদের বিশ্ব-কর্তৃত্ব থেকে পশ্চিমাদের হটানোর স্বপ্ন দেখিয়েছে।

মিশরের ইসলামি আন্দোলন

যায়াতের মতে, অটোমান খিলাফতের পতন ও আরবে পশ্চিমা বিধি-নিষেধ প্রবেশই মিশরে ইসলামি আন্দোলন শুরু হওয়ার মূল কারণ। সমাজের কিছু অংশ পশ্চিমা জীবনধারা ও রাজনৈতিক ধরন ত্যাগ করে জনজীবনে ইসলামি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছিল দাওয়াহর মাধ্যমে বা অন্য মুসলিমদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে।

যায়াত ইসলামি আন্দোলনকে মিশরে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও ঐ অঞ্চলে পশ্চিমা কর্তৃত্বের ভয়ঙ্কর নিপীড়নের ফলাফল হিসেবে দেখে। জামাল আবদেল নাসের ১৯৫৩ সালে ক্ষমতায় আসার পরপরই এই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল। আধুনিকায়নের নামে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামিস্টদের রাজনীতিতে প্রবেশ করার পথ বন্ধ করার মাধ্যমে নাসের ইসলামি আন্দোলনের টুটি চেপে ধরে। সেসময় সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি দল ছিল মুসলিম ব্রাদারহুড। যায়াত উল্লেখ করেছেন, নাসেরের প্রবল দমনপীড়ন ও কুকর্মের কারণে এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের হতাশা ইসলামি আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়।

এই পরাজয়ের কারণে মিশর বাহিনী ইসরায়েলের কাছে হেরে যায় এবং সিনাই উপদ্বীপ ইসরায়েল দখল করে নেয়। ইসলামি আন্দোলনের মধ্যে নিরাশ মিশরীয় যুবকরা আশার আলো দেখতে পায়।

১৯৭০ সালে নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার আল-সাদাত রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইসলামি দলগুলোর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে সে ইসলামি দলগুলোর সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়। সাদাতের যুগে ইসলামি দলগুলো বর্তমান সরকার ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিল। ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করে এই দলগুলোর সদস্য ও নেতৃত্বের সংখ্যা বাড়ছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন জোট কিংবা উপদল তৈরি হচ্ছিল। এই সময়ই এই আন্দোলন ইসলামি শরিয়াহকে অপমান করার দায়ে দেশের সরকার ও এর আইন-কানুনের বিরুদ্ধে অবস্থানের আহ্বান করে। জনজীবনে ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং অনৈসলামিক সরকার উৎখাত করতে বিভিন্ন দল মিশরীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর নানাভাবে আক্রমণ করছিল। মিশরের সরকার উচ্ছেদের জন্য প্রথম মিলিটারি আক্রমণ করে *আল-তাকফির ওয়াল হিজরা* দলটি। এই দলের প্রধান ছিল শাকেরি মুস্তফা। ১৯৭৭ সালে কয়েকজন বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে মিশর প্রশাসন তাকে আটক করে। বর্তমানে মিশরে সামান্য কয়েকটি জিহাদি দল বা মিলিট্যান্ট ইসলামি দলের অস্তিত্ব রয়েছে। তার মধ্যে ইসলামি জিহাদ ও জামাআ আল-ইসলামিয়া অন্যতম। উভয় দলই ১৯৮০ সালে সাদাত হত্যায় সহযোগিতা করেছিল। জিহাদি দলগুলোর মধ্যে জামাআ আল-ইসলামিয়া সবচেয়ে হিংস্র হিসেবে পরিচিত ছিল, ১৯৯৭ সালে লাক্সরে পর্যটকদের ওপর তাদের পরিচালিত কুখ্যাত হামলার কারণে। এই আক্রমণের পর এই দলের নীতিমালায় আমূল পরিবর্তন আসে, ১৯৯৯ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি এই পরিবর্তনেরই ফলাফল। যদিও মিশরের বাইরে অবস্থানরত কয়েকজন সদস্যদের আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু মিশর সরকারের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার পর এই দলের পক্ষ থেকে কোনো হামলা করা হয়নি। যদিও দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতা

তাহা মুসাকে (রাফেই আহমেদ তাহা) ২০০০ সালে ওসামা বিন লাদেন ও জাওয়াহিরির সাথে একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল, সেখানে সে আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা করার হুমকি দিচ্ছিল, তারপরও জামাআ আল-ইসলামিয়া দলের আল-কায়েদার সাথে ঘোষিত কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিভিন্ন দল এবং তাদের মতাদর্শ নিয়ে এখনও অনেক জট রয়েছে। সেসময়ে দলগুলোকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে যায়াত সেই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ইসলামিস্টদের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ও আল-কায়েদায় গিয়ে ঠেকেছে।

দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা হয়—এমন ভুল ধারণারও জবাব দিয়েছে বইটি। মিশরীয় ইসলামিস্টের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা কোল্ড ওয়ারের গেরিলা যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাথে এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িত মিশরীয় ইসলামিস্টরা উচ্চশিক্ষিত। তারা এই আন্দোলনের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করেছে।

আল-কায়েদা

আল-কায়েদা (আক্ষরিক অর্থ—ভিত্তি) বিভিন্ন হামলা পরিচালনার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কুখ্যাত ইসলামি দলে পরিচিত হচ্ছে। হামলাগুলো তাদের দলের সদস্যদের দ্বারা বা সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত করা হয়। এই দল কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হামলা হলো সৌদি আরবের খুবারে আমেরিকান ঘাঁটিতে হামলা, ১৯৯৫ সালে ইসলামাবাদে মিশরীয় দূতাবাসে হামলা, ১৯৯৮ সালের ৭ অগাস্ট কেনিয়া ও তানজানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে হামলা এবং সবচেয়ে কুখ্যাত—নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের প্যান্টাগন বিল্ডিং-এ পরিচালিত হামলা।

সোভিয়েত যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলো থেকে যুদ্ধে অংশ নিতে আসা আরব আফগানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে আল-কায়েদার জন্ম হয়। ১৯৮০ এর দশকে

আয়মান আল-জাওয়াহিরি ও উত্তরাধিকারসূত্রে মিলিয়নিয়ার হওয়া সৌদি নাগরিক ওসামা বিন লাদেন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইসলামিস্টদের কাছে এটি আফগান জিহাদ নামে পরিচিত।

হাস্যকর বিষয় হলো, কোল্ড ওয়ারের কৌশল হিসেবে আমেরিকান সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আফগান জিহাদে আফগানিস্তানকে বস্তুগত ও কৌশলগত সহযোগিতা করেছিল। সোভিয়েত যুদ্ধে আফগানিস্তানে থাকাকালীন জাওয়াহিরি ও বিন লাদেনের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ১৯৯৮ সালে *ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফ্রন্ট* গঠনের উদ্দেশ্য মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ দলের আল-কায়েদার সাথে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল আরব উপদ্বীপ থেকে আমেরিকার উপস্থিতি দূর করা, ইরাক অবরোধের সমাপ্তি আনা এবং পবিত্র ভূমি জেরুসালেমকে ইসরায়েলের দখলদারত্ব থেকে মুক্ত করা। আল-কায়েদার খুটিনাটি অনেক ঘটনা গবেষক ও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছেও অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য। রোহান গুনরত্নের লেখা *Al-Qaeda, Global Network of Terror* অনুযায়ী, এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জঙ্গি সংগঠন ও গোপন দল নিয়ে গঠিত। আর আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা এদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার কাজ করে। এই দলের সাংগঠনিক কাঠামো, আফগানিস্তানে এই দলের নেতাদের কর্তৃত্ব কতটুকু—এসব বিষয় এখনও বিশ্লেষকদের কাছে পরিষ্কার নয়। সেজন্য, অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্মিলিত বক্ষমান বইটি বর্তমান বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করা দলটির উৎস সম্পর্কে জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হতে পারে।

ড. আযযা করিম
জিয়াউদ্দিন সরদার

ভূমিকা

যে আয়মান আল–জাওয়াহিরিকে আমি চিনতাম

ইব্রাহিম এম. আবু রাবি,
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ এণ্ড মুসলিম-খ্রিষ্টান রিলেশনশিপ, হার্টফোড সেমিনারী

মিশরের ইসলামি আন্দোলন নিয়ে রচিত বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে এই বইটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, হালনাগাদ ও আত্মসমালোচনা সমৃদ্ধ আলোচনা। ইসলামি আন্দোলন নিয়ে অসংখ্য লেখা রয়েছে যদিও সেগুলোর খুব কম সংখ্যকই সমসাময়িক ইসলামিজমের ভেতরের দৃশ্য দেখাতে পারে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা হামলার কারণে সৃষ্ট দুঃখ-দূর্দশা ও চ্যালেঞ্জের চিত্রও কম উঠে আসে। এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মিশরীয় ইসলামিস্ট আইনজীবী মুনতাসির আল-যায়াত, ইসলামি জিহাদ দলের প্রতিষ্ঠাতা আল-কায়েদার দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ড. আইমান আল-জাওয়াহিরির জীবন, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনাপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আমেরিকার মতে, জাওয়াহিরিই ১১ সেপ্টেম্বর হামলার ব্রেইন হিসেবে কাজ করেছে।

এই বইটিতে ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তানে যাওয়ার আগের জাওয়াহিরির সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও মিশরীয় ইসলামিস্টদের সাথে কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে।

সমসাময়িক রাজনীতিতে ইসলামিস্টদের ভূমিকা, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শন, ২০০১ সালে আমেরিকা হামলার মতো বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে খ্যাতি-অখ্যাতি—এসব বিষয়ে পশ্চিমা সাহিত্যজগতে খুব কম লেখালেখি হয়েছে। সেকারণে বক্ষমান বইটি সাদরে গৃহীত হবার দাবি রাখে। এই কাজটির গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা দেখিয়ে দেয় যে, আফগানিস্তান কেন্দ্রিক *আল-কায়েদার* আমেরিকা হামলার কারণে পুরো বিশ্বের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছে। নিঃসন্দেহে কোল্ড ওয়ার পরবর্তী বিষয়গুলো

বুঝতে হবে: ১৯৯০ দশকরের শুরুর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের মাধ্যমে আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য, ইরাকে মার্কিন হামলা ও বাথিস্ট সরকারের উচ্ছেদসহ বিভিন্ন বিষয়।

লেখকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হলো—মুসলিম বিশ্বে আধুনিক ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সরকারের সাথে হিংস্রতা প্রচার করে। আর কেবল আরব ও মুসলিম সরকারগুলোর রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এই মৌলবাদী চাল-চলনের পেছনে দায়ি। তাছাড়া, আমেরিকার ওপর হামলা মুসলিম দেশসমূহের প্রশাসনকে যেন ইসলামিস্টদের ওপর আগের চেয়ে বেশি অত্যাচার করার অনুমতি দিয়েছে। এমনকি গণতন্ত্রের দাবি করা যেকোনো ব্যক্তিও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরোধীতার নামে অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ ঘোষণা করার পর তাদের অস্বাভাবিক কর্তৃত্বে সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমেরিকার সহায়তায় মুসলিম বিশ্বের স্বৈরশাসকেরা আরও শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে।

শুরুতেই একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, আরব ও মুসলিম বিশ্বের আধুনিক ইসলামিজম কোনো একমুখী বিষয় নয়। আধুনিক মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে তিন ধরনের ইসলামিজম রয়েছে:

(১) উপনিবেশ পূর্ব

(২) উপনিবেশিক

(৩) উপনিবেশ-পরবর্তী।

ওহাবিজম প্রথম ভাগটিতে ব্যর্থ হয়েছে। মিশরের ইখওয়ান বা মুসলিম ব্রাদারহুড ব্যর্থ হয়েছে দ্বিতীয় ভাগে। আর ইসলামি জিহাদ ও জামাআ আল-ইসলামিয়া ব্যর্থ হয়েছে তৃতীয় ভাগে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, আধুনিক পরিস্থিতিই মুসলিম বিশ্বের আধুনিক ইসলামিজের জন্য দায়ি। যেমন—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশের বিস্তার, জাতিরাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের আধুনিকায়ন কার্যক্রমের ব্যর্থতা—এগুলো আধুনিক ইসলামিজম সৃষ্টিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

আরও কিছু কারণ হলো, আধুনিক আরব সমাজ প্রচুর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে, এর ফলে ধর্মের

মর্যাদা এবং সমাজের সাথে ধর্মের সম্পর্ক যেমন প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কও প্রভাবিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই পরিবর্তনগুলো আলেমদের ভূমিকা ও অবস্থানকেও প্রভাবিত করেছে। ইসলামি আন্দোলন ও জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভবে ধর্মীয় পণ্ডিতেরা নিজেদের চ্যালেঞ্জিং একটা জায়গায় আবিষ্কার করছে।

যদিও আধুনিক মুসলিম বিশ্ব অল্প বা অধিকহারে পশ্চিমাকরণের মাধ্যমে আধুনিক সমাজ গড়ার চেষ্টা করছে, তবুও তারা ধর্মীয় কর্তৃত্ব দূর করতে পারেনি। ঐতিহ্যগতভাবে, আলেমশ্রেণি জনসাধারণের সুবিধার কথা চিন্তা করে আইন-কানুনের বৈধতা প্রদান করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে, 'সরকারি ইসলাম' মুসলিম সমাজের অভিজাত কর্তাব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। ধর্মীয়তত্ত্ব সরিয়ে রাখলে ইসলাম শহুরে পরিবেশে গড়ে উঠেছে ও 'শহুরে মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এর সীমানা নির্ধারিত হয়েছে।'[১] এর গঠন ও সম্প্রসারণের সময়ে ইসলাম এমন একটি সার্বজনীন গোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখেছিল, যারা জাতিগত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যাবে।

যাইহোক, কেন্দ্রীয় আলেমগণ একটি সার্বজনীন রূপরেখার কথা বললেও মুসলিম বিশ্বে কোনো সম্মিলিত কেন্দ্রীয় 'চার্চ' কখনও ছিল না। আলেমরা, বিশেষ করে সুন্নি আলেমরা অল্পবিস্তর রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের প্রতিরোধে এড়িয়ে এসেছেন। মূলধারার আলেমরা তাদের বৈধতা ও প্রভাব ব্যবহার করে প্রায়ই রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে সমর্থন জানিয়েছেন। "সুন্নি আলেমরা কখনও সুসংগঠিতভাবে কাজ করতে পারেনি, মতভেদ থাকায় তারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক।"[২] উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর অনেক মুসলিম দেশ ধর্মীয় ও ইসলামি বিষয়াদি নিয়ে মন্ত্রণালয় গঠন করেছে আর কিছু আলেমকে

---

১. এল কার্ল ব্রাউনের "Religion and State: The Muslim Approach to Politics (New York: Columbia University Press, 2000), 27.
২. Ibid, 33

ইসলামের মুখপাত্র ঘোষণা করেছে। এই ঘোষিত ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যে খুব কমই আরব ও মুসলিম বিশ্বে ঘটমান সমস্যার কথা শোনা যায়। তাদের বক্তব্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও মুসলিম সমাজে চলা জুলুম-নির্যাতনের কথা পাওয়া যায় না। ইসলামিজমের জাগরণে ও ধর্মীয় বিষয়গুলোতে এর আকর্ষণীয় স্পষ্ট ব্যক্তব্যের কারণে আলেমদের অবস্থান আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এই জাগরণে সরকারও নিজের সামনে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছে, একইভাবে সশস্ত্র বিরোধিতাও অনিবার্য—যেমনটা ১৯৮০ দশকে সিরিয়া ও ১৯৯০ দশকে আলজেরিয়ায় হয়েছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর একাধিক শত্রু আছে বলে মনে করা হতো: মার্কসবাদী ও ইসলামিস্ট উভয়দের কারাবন্দী করা হতো। জাতীয়তাবাদ পরবর্তী ও ১৯৬৭ পরবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোর একটিই শত্রু আছে বলে মনে করা হচ্ছে: ইসলামিস্টরা। এমনকি "সকল সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শাসকেরা এমনসব আইন জারি করে যেগুলো মতপ্রকাশ, আলোচনা ও যুক্তিতর্কের স্বাধীনতায় বাঁধা প্রদান করে।"[৩] মিশরীয় চিন্তাবিদ আহমেদ কামাল আবুল মাজদের ভাষায় "বেশিরভাগ আরব দেশ ইসলামিজম, এমনকি মডারেট ইসলামিজমকে 'নিরাপত্তার জন্য হুমকি' হিসেবে গণ্য করে।"[৪] আরবে বেশিরভাগ ইসলামি আন্দোলনের সূচনা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সময়। এসময় জাতি-রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি আন্দোলনের সম্পর্কেও সবচেয়ে বেশি অস্থিরতা দেখা দেয়। আরব দেশগুলোতে গণতন্ত্রের অভাব ছোট ছোট কিছু ইসলামি দলকে

৩. দেখুন বুরহান গালিয়ুন-এর "Al-Islam wa azmat 'alaqat al-sultah al-ijtima'iyyah", in 'Abd al-Baqi al-Hirmasi et al-Din fi'l mujtama' al-'arabi (Beirut: Markaz Dirasat al-Wih*dah al-ëArabiyyah, 1990), 305. See also Ghalyun, Le malaise arabe: l'État contre la nation (Paris: La Découverte, 1991).

৪. Ahmad Kamal Abu'l Majd, "Surat al-hhalah al-islamiyyah 'ala masharif alfiyyah jadidah," Wijhat Nadhar, volume 1(11), December, 1999, 6.

সমসাময়িক খারাপ অবস্থার প্রতিরোধে হিংস্রতা বেছে নিতে বাধ্য করেছে।[৫]

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের পর থেকে[৬] পশ্চিমা বিশ্ব সকল ইসলামি কর্মকাণ্ডকে একই শ্রেণিভুক্ত করছে—মৌলবাদ বা সন্ত্রাস।[৭] কেউ কেউ তো ইসলামিজমকে ফ্যাসিবাদের মতো মনে করছে। কেউ কেউ আবার ইসলামিজমকে নতুন বিশ্ব সভ্যতার জন্য হুমকি মনে করছে।[৮] অল্পসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক পড়াশোনা করার ও

---

৫. On this point, see Muhammad Mahdi Shams al-Din, Fiqh al-'unf al-musallah fi'l Islam (Beirut: al-Mu'assassah al-Dawliyyah li'l Dirasat wa'l Nashr, 2001).

৬. ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আন্ডারসন কর্তৃক প্রদানকৃত যুক্তি ছিল:
প্রজাতন্ত্রিক প্রশাসন সমর্থিত, এমনকি সাম্যবাদী যেকোনো ব্যক্তি মাত্রই সচেতন যে ১১ সেপ্টেম্বর কেবল সংঘাতহীন ক্ষতি নয়, বরং এটি মধ্যপ্রাচ্যের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাপক অপছন্দের একটি প্রতিক্রিয়া। এই অঞ্চলে ইউরোপ, রাশিয়া, চীন, জাপান বা ল্যাটিন আমেরিকার মতো নয়—এখানে বলবৎ এমন কোনো শাসনব্যবস্থা নেই, যা বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমেরিকান সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক নেতৃত্বের কার্যকর চুক্তি হস্তান্তরে গোড়াপত্তন করেছে। বিবিধ আরব রাষ্ট্রগুলো যথেষ্ট নীতিযুক্ত, তবে তাদের অভাব রয়েছে জনসমর্থনের, উপরন্ত ঘরোয়া সম্প্রচার এবং গোয়েন্দা সংস্থার, যা দক্ষ হাতে আমেরিকার পক্ষে কর্মকাণ্ড বন্ধের কথা না বলেই মিডিয়া বিদ্বেষের ভারসাম্য রক্ষা করবে। স্বতন্ত্রভাবে অবশ্যই এ অঞ্চলে ওয়াশিংটনের প্রাচীনতম নির্ভরতা এবং সবচেয়ে মূল্যবান ক্লায়েন্ট, সৌদি আরব, উত্তর কোরিয়ার পর বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় মার্কিন সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের অন্যতম প্রতিবন্ধক। Perry Anderson, "Force and consent", New Left Review, number 17 (September/October, 2002), 16.

৭. দেখুন আফতাব এ. মালিকের Shattered Illusions: Analyzing the War on terrorism (Bristol, England: Amal Press, 2002)।

৮. যে কাউকে এ বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণের সাথে একমত হতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রকে আজকাল যেসকল হুমকি দেওয়া হয় তা "ধর্মান্ধ ইসলাম" নয়, বরং অন্যান্য শক্তি; অন্ধকারময় বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং এর অস্থায়ী মন্দা জাগরণপূর্ব মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসল হুমকি আজ মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ ওয়াহহাবি থেকে আসে না বরং জাপানের অচল অর্থনীতি থেকে আসে। ক্ষয়প্রাপ্তকরণ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরণ গতি সঞ্চার করছে যা পুরো বিশ্ব না হলেও একটি অঞ্চলকে নিঃশেষ করে দেয়। গ্যাভান ম্যাককর্ম্যাক, "Breaking the Iron Triangle" New Left Review, Number 13 (January/February, 2002), 5

ইসলামি জাগরণের সামাজিক উদ্ভব নিয়ে পড়াশোনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর তার চেয়েও কম ব্যক্তি এটা প্রকাশ করে যে, বেশিরভাগ ইসলামি দল, এমনকি রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ দলগুলোও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংস্রতা অবলম্বন করে না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন আরব দেশগুলোর জন্য পুনর্জাগরণ একপ্রকার আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিভিন্ন চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে ইসলামি ঐতিহ্য নতুন কার্যপদ্ধতির ধারণা দিচ্ছে। বিচ্ছিন্নবাদীদের অর্থহীন সমাজের নতুন সংজ্ঞা প্রদান করছে। ইসলামিজমকে ও এটার রাজনৈতিক প্রকৃতি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে এটার সম্ভাব্য সম্পর্ক বুঝতে হলে নিচের বিষয়গুলো[৯] বিবেচনায় রাখতে হবে:

(১) ইসলামিজম (অথবা মৌলবাদ) মুসলিম বিশ্বের একটি বহুমুখী সমস্যা। এটি বাস্তবেই ধর্মীয় বিষয় নয়।

(২) ইসলামিজমকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়; যেমন, প্রি-কলোনিয়াল, কলোনিয়াল ও কলোনিয়াল-পরবর্তী।

(৩) ইসলামিজম গত দুই শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বে চলতে থাকা সমস্যাগুলোর ফসল।

(৪) ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, ইসলামিজম মুসলিম বিশ্বে আধুনিক ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের ফলাফল ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদের হেরে যাওয়ার ফলাফল।

(৫) ইসলামিজমের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কটি জটিল। ওয়াহাবিজমের ক্ষেত্রে, ইসলামিজম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামিজম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিবাদপূর্ণ। মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র

আরও দেখুন, পল বারম্যানের "Al-Qaeda's Philosopher: How an Egyptian Islamist Invented the Terrorist Jihad from his Jail Cell", New York Times Magazine, March 23, 2003.

৯. ইসলাম ধর্মের হতাশাজনক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জন এল এস্পোসিতো'র Unholy War: Terror in the Name of Islam (New York: Oxford University Press, 2002) এই বইটির পর্যালোচনা দেখুন ইব্রাহিম এম আবু-রাবি'র, "Jihn Esposito's Unholy War", The Muslim World, volume 92 (3 & 4), Fall, 2002: 494-500

প্রতিষ্ঠা—ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্রচার করা উনিশ শতকে সৃষ্ট একটি বস্তু।

(৬) ইসলামিজম কখনও স্থিতিশীল বিষয় ছিল না। জনসাধারণের সমর্থন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অর্জনের জন্য এটি শক্তিশালী ধর্মীয় বৈধতা উদ্ভাবন করেছে।

(৭) বিভিন্ন কারণে গত চার দশকে ইসলামিজম একটি সঙ্কটে পরিণত হয়েছে: প্রথমত, পুরো মুসলিম বিশ্ব সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আছে। দ্বিতীয়ত, ইসলামিজমের নতুন কর্তাব্যক্তিরা তাদের অর্জন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। ওহাবিজমের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য, আর বিন লাদেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইসলামিজম বেশ কিছু পূণ্যের উৎস তৈরি করেছে। এটি এমন একটি ধারণা, যা মানুষের কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যা মানুষের মৃত্যু ও পরকালের ভয়কে প্রশমন করে। আরব দেশগুলোতে অর্থনৈতিক আধুনিকায়ন ও পশ্চিমাকরণের ফলেও ধর্মীয় বিশুদ্ধতা কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নতুন রূপ লাভ করছে। ধনী নর্তকী ও অভিনেত্রীদের নিকাব পরতে শুরু করার খবর এখন আর অস্বাভাবিক কিছু নয়। আগে এধরনের ঘটনাগুলোর সাথে আরব বিশ্ব পরিচিত ছিল না। পশ্চিমা বিশ্বের শিল্প ও সিনেমা জগৎ—যেটা কিনা স্বার্থপরতার জগৎ হিসেবে বিখ্যাত—সেটা এখন আরব বিশ্বে ধার্মিকতার জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। বিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতারা এমন বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখছে যেগুলোর অর্থ কেবল আলেমরা বলতে পারেন। এটি একটি নতুন যুগের ভোর মাত্র।

এছাড়াও আরব বিশ্বে ইসলামিজমের অর্থনৈতিক উৎসের বিষয়টি অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বা উনিশ শতকের শেষের দিকে ইসলামিজম আরব বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে ইসলামিজম শুধু একটি আধুনিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন ইসলামিক অনুশাসনই প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলামি

অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ১৯২০ দশকে মিশরে ইখওয়ান বা মুসলিম ব্রাদারহুডের উত্থান এবং ১৯৪০ দশকের শেষের দিকে পুরো আরব বিশ্বে এর বিস্তৃতি দলটিকে আরব বিশ্বে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়েছিল। ১৯৫০ এর দশকে সিরিয়া ও জর্দানের ক্ষেত্রে বিষয়টি যেমন সত্য, ১৯৪০ দশকে মিশরের ক্ষেত্রেও তেমনিই সত্য।

১৯৬০ দশকে মিশরে শত শত ইখওয়ানের সদস্যদের ওপর নাসের সরকারের চরম নিপীড়ন ও কারাবন্দী করার ফলে ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য দেশে মিশরীয় কর্মীদের চলে যাওয়া ইখওয়ানের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ার সুযোগ করে দেয়। মোটের উপর, ১৯৮০ ও ১৯৯০ দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামিস্ট দলগুলোর বিচরণ অনেক আরব দেশেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর কারণ, দলগুলো ক্ষমতা অর্জন করছিল। আরব বিশ্বের প্রশাসনগুলো অনেকের ওপরই পাশবিক নির্যাতন চালায় এবং তাদের মৌলবাদীতার দিকে ঠেলে দেয়। ইসলামিজমের অর্থনৈতিক বিষয়টি বুঝতে হলে ক্রমান্বয়ে এগুতে হবে। রাজনীতিতে ইসলামিস্টদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে অর্থনীতিতেও ইসলামিস্টদের বিচরণ নিষিদ্ধ করা হয়।

অনেক আরব চিন্তাবিদ আরব জনগণের করুণ অবস্থার সাথে মৌলবাদীদের উত্থানের গভীর সম্পর্কের কথা বলেন। এটা পরিষ্কার যে, ইসলামি জাগরণের বিরোধীরা এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য তথা দেশের কর্তৃত্ব নিতে চাওয়া উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে। আফসোস, আরব বিশ্বে ধর্ম ও বর্তমানে ধর্মীয় জাগরণ নিয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে। Center for Arab Studies in Beirut এর প্রয়াস, কয়েকজন আরব সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের গবেষণা ছাড়া আরব বিশ্বে ধর্মসংক্রান্ত নিখুঁত কিতাবি আলোচনার দেখা পাওয়া যায় না। ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ঘাটতি এটা প্রমাণ করে যে, ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক বিষয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক কিছু বিষয় ছাড়া একাডেমিক দিক থেকে এটি কোনো দলিল নয়। আরব সেক্যুলারদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। তারা মনে করে,

ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা গেলে ধর্মীয় জাগরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলবে। রাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে সেক্যুলার ও পশ্চিমা উপনিবেশিকদের মতামতের তেমন একটা পার্থক্য নেই।

রাষ্ট্র আলেমদের কাছ থেকে বৈধতা লাভে ব্যর্থ হলে অবশ্যই ইসলামি রাজনীতিকে এর সমাধান হিসেবে দেখা হবে। অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্র বিভিন্ন কাজে ধর্মের যুক্ততা নাকচ করে। আর এই বিষয়টিই আধুনিক আরব সমাজ, রাজনৈতিক জোয়ার-ভাটা ও আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত। ধর্ম নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, মিলিটারি, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে হুমকি হয়ে উঠেছে। এই অবস্থানটি শক্তিশালী হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর হামলার মাধ্যমে।

যায়াতের বইয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে গত তিন দশকের ইসলামি আন্দোলনের বেশ কিছু বিষয়ের ওপর। ইসলামিস্টদের লেখালেখিতে এই বিষয়টি দুর্লভ। ১৯৬৬ সালে মিশরীয় প্রশাসনের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাইয়েদ কুতুবসহ বিভিন্ন ইসলামিস্ট নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।

বইটির শক্তিমত্তা এই বাস্তবতার কাছে এসে কমে যায় যে বইটির লেখক জামাআ আল-ইসলামিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। জামাআ আল-ইসলামিয়া একটি ইসলামি সংগঠন যেটা একসময় মিশরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতো।

কুতুবের ফাঁসির পর মিশর এবং আরব বিশ্বে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে। যেমন—ইখওয়ানের হাজারো সদস্যের কারাবন্দী হওয়া, ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলের কাছে আরবের পরাজিত হওয়া, নাসের সরকার সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যের ভিত্তিতে আরব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়া, ১৯৭০ সালে নাসেরের মৃত্যু এবং একই বছর সাদাতের ক্ষমতা গ্রহণ এবং ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে মিশর থেকে নাসেরিকরণ দূর করার চেষ্টা করা। এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯৭০ দশকে

মিশরের আধুনিকায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, মিশরীয় সমাজের অর্থনৈতিক আদর্শিক বিষয়ে পরিবর্তন আনে। ফলে কুতুবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বিশেষ করে কুতুবের ফাঁসির সময়টায় মিশরে ইসলামি আন্দোলনের চোখে পড়ার মতো উত্থান ঘটে।

যায়াত এই বিষয়টি সঠিক বলেছেন যে, জাওয়াহিরি কুতুবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাকে ইসলামি আন্দোলনের মহান শহিদ অগ্রদূত হিসেবেও ধরে নিয়েছে। কুতুবের *ফি যিলালিল কুরআন*[১০] খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কর্ম।

যায়াতের মতে, মিশরীয় প্রশাসন ভেবেছিল, কুতুবের ফাঁসির মাধ্যমে ইসলামি আন্দোলনের পতন ঘটবে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা বুঝতে পেরেছিল যে কুতুবের চিন্তাধারা থেকে জিহাদি আন্দোলনের উত্থান ঘটছে। কুতুবের ফাঁসি আর তার মৌলবাদী চিন্তাধারা ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রসারিত হচ্ছে, বর্তমানে যেটা হয়েই আসছে কয়েক দশক ধরে।

১৯৭০ এর দশকে মিশর মৌলবাদী ইসলামি আন্দোলনের প্রখরতা দেখেছিল, তবে ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে মিশরের কারাগারে তৈরি হওয়া জামাআ আল-ইসলামিয়া ও জিহাদি দলের দিকে তাদের খুব বেশি মনোযোগ ছিল না। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ১৯৮১ সালের সাদাত হত্যাকাণ্ডের কারণে ইসলামি আন্দোলনকে সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তখন হাজারো সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়, অনেকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

যায়াত জাওয়াহিরির সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। জাওয়াহিরি অভিজাত পরিবারের সন্তান; তার নানা প্রয়াত আব্দেল রাহমান আযযাম পাশা ছিলেন আরব লীগের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫২ সালের পূর্বে মুসলিম রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

---

১০. দেখুন ইব্রাহিম এম আবু-রাবি'র "Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World (Albany: State University of New York Press, 1996)

করেছেন। সামাজিক মর্যাদা ও হিংস্র ইসলামিজমের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?

যায়াত হয়তো মনে করেন, মতবাদসংক্রান্ত কারণে ইসলামি বিশ্বাস ও আদর্শ সবধরনের মানুষের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। জাওয়াহিরির সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান উল্লেখের মাধ্যমে যায়াত বুঝাতে চেয়েছেন, ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলের কাছে আরবের পরাজয় জাওয়াহিরির মতো ১৯৬০-১৯৭০ দশকের যুবকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গভীরভাবে দেখলে, ১৯৬৭ সালের আরবের পরাজয়, ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমাদের সহযোগিতা বা Malcolm Kerr এর ভাষায় 'আরবের মধ্যকার কোল্ড ওয়ার' ছিল আধুনিক আরব সমাজের সাংগঠনিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থানের প্রতিফলন। তাছাড়া, এই ঘটনা ইসরায়েল জায়ানিজমের আরবে রাজনৈতিক ও সামরিক আক্রমণের সময় আরব দেশগুলোর একে-অপরের সাথে ঘনিষ্ঠতার কমতিও প্রকাশ করে।[১১] ১৯৪৭ সালে যখন ইসরায়েল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আরব ও মুসলিম বিশ্ব প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। ১৯৬৭ সালের পরাজয়, উনিশ শতকে শুরু হওয়া নাসের সরকারের 'আরব প্রগ্রেসিভ প্রজেক্ট' ও আরব জাতীয়তাবাদ প্রকল্পকে বাঁধা প্রদান করে। আরব বিশ্বকে আস্তে আস্তে তিক্ত বাস্তবতার কথা জানিয়ে দেয়। জানিয়ে দেয় ইসরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সম্পর্কে। কষ্টদায়ক বাস্তবতা ও আরবের ভবিষ্যত করণীয়র মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে আনা যায়—এ বিষয়ে ভাবতে শেখায়। পরাজয়ের সেই দুঃখের সময়ে আরব বিশ্বের চিন্তা-ভাবনায় অদ্ভুত অসাড়তা দেখা দিয়েছিল। কেউ বুঝতে পারছিল না আসলে তখন কী করা উচিত। আরব চিন্তাবিদ গাসান কানাফানির ভাষায়, আরব বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এমন অচল হয়ে পড়ে যে তারা

---

১১. লেবাননের ঔপন্যাসিক ইলিয়াস খুরি ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আরব চিন্তায় ত্রিগুণ অনুপস্থিতি: (১) চেতনা না থাকা; (২) পরিকল্পনার অনুপস্থিতি; এবং (৩) স্ব-অনুপস্থিতি। দেখুন ইলিয়াস খুরি'র "Al-Nakbah wa'l sira 'ala al-kalimat". At-tariq, volume 57 (3), May-june, 1998, 4-9

নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবছিল 'blind language'[১২] দিয়ে। মানে তারা অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল। নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল তার লক্ষ্য ও কোনোরকম কলাকৌশল করার ক্ষমতা।

এমন পরিস্থিতিতে নাসের পদত্যাগ করে আর আবদুল হাকিম আত্মহত্যা করে। গণতান্ত্রিকভাবে আরব সমাজ ও মানুষের পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন অনুভব করছিল সবাই।[১৩] ১৯৭৬ সালের পরাজয় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে যে, গণতান্ত্রিক ও মুক্তচিন্তার পরিবেশে নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন নতুন ব্যক্তির প্রয়োজন। আরবের পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনাপূর্ণ লেখালেখিরও বিস্তার ঘটে ১৯৬৭ সালে। এই আলোচনা রাজনীতি থেকে শুরু করে দার্শনিক দিকেও ধাবিত হয়, তবে এসব আলোচনা ফলপ্রসূ ছিল। একই সময়ে ১৯৬৭ সালের পরাজয় আরব চিন্তাবিদদের এমন বিষয় নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যেগুলো নিয়ে আগে তাদের মনে সন্দেহ ছিল না। এমনকি আরবদের সর্বস্বীকৃত কিছু চিন্তাভাবনা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। আরবের বামপন্থী, ইসলামি ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে এই পরাজয় নাড়া দিয়েছিল। তারা সবাই নিজেদের মতবাদকে এই পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান হিসেবে জাহির করছিল। আত্মসমালোচনা ও পুনর্জাগরণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল আরব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। আরব বামপন্থীরা আত্মসমালোচনা ও পর্যালোচনার কাজ কাঁধে তুলে নেয়। পাশাপাশি তাদের কাজ ছিল কয়েক দশকের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করে ইসলামি ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করা। বামপন্থীদের মধ্যে ইয়াসিন আল-হাফিজ *Ideology and Defeated-ideology,*[১৪] সাদিক জালাল আল-আজম Self-

---

১২. Ghassan Kanafani, "Thoughts on Change and tge 'Blind language'," in Ferial J. Ghazoul and Barbara Harlow, eds., the view from Within Writers and Critics on Contemporary Arabic literature (Cairo: American University of Cairo press, 1994), 43

১৩. Tharwat 'Ukashah, Mudhakarat fi'l thaqafah wa'l siyassah, volume 2 (Cairo: Dar al-Hilal, 1990), 375.

১৪. Yassin al-Hafiz, al-Hazimah wa'l idiulujiyyah al-mahz mah (Beirut: Dar alTali'ah, 1979).

Criticism After Defeat[১৫] ও Criticism of Religious Thought[১৬] এবং আব্দুল্লাহ লারোই L'idéologie arabe contemporaine[১৭] লিখেছিলেন। ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে ইউসুফ আল-কারযাবী The Islamic Solution[১৮] লিখেছিলেন। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কসটানটাইন যুরায়ক লিখেছিলেন Revisiting the Meaning of Disaster[১৯]। এসব চিন্তাবিদ ও যারা এসব বিষয়ে জড়িত ছিল তারা বিভিন্নভাবে এই প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করেছেন: "কেন আমরা পরাজিত হলাম এবং এই পরিস্থিতির প্রতিকার কী?"[২০]

আরব ও মুসলিম ইতিহাসের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে জাওয়াহিরি তেমন একটা লেখালেখি করেনি। তবে এটা উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, তার মতো যুবকদের জন্য এটি সঙ্কটময় পর্যায় ছিল। আর সম্ভবত এই ঘটনাই তাকে সমাজ বাঁচানোর জন্য সরকারের বিরুদ্ধে হিংস্র পন্থা বেছে নিতে বাধ্য করে।

---

১৫. Sadiq Jalal al-'Azm, al-Naqd al-dhati ba'dah al-hazimah (Beirut: Dar alTali'ah, 1969.
'আজম দাবি করে যে আরব ব্যক্তিত্বের সাথেই কিছু পরাজয় ছিল, প্রকৃতিতে যা ফাহলাওই (পারশিয়ান ভাষায় ফালাভি), একটি মতামত যা কতক আচরণের বৈশিষ্ট্যসূচক সমন্বয়, ফুয়াদ মোগরবির ভাষায় "...অন্যরা আরবদের মধ্যে 'বাস্তবতা পরখের অপ্রাতুলতা' বলে অভিহিত করার সাথে সম্পর্কিত।"
Fouad Moughrabi, "The Arabic Basic Personality: A Critical Survey of the literature", International Journal of Middle East Studies, volume 9 (1), February, 1978, 104

১৬. Sadiq Jalal al-'Azm, Naqd al-fikr al-dini (Beirut: Dar al-Tali'ah, 1969).

১৭. Abdallah Laroui, L'idéologie arabe contemporaine (Paris: Maspero, 1970).

১৮. Yusuf al-Qaradawi, al-Hall al-islami, faridah wa darurah (Beirut: Mu'assassat al-Risalah, 1989).

১৯. Costantine Zurayk, Ma'nah al-nakbah mujaddadan, in al-A'mal al-fikriyyah al-'ammah li Custantine Zurayk, volume 2 (Beirut: Markaz Dirasat alWihdah al-'Arabiyyah, 1994).

২০. দেখুন Sayyid Yassin, al-Shakhs iyyah al-'arabiyyah bayna surat al-dhat wa mafhum al-akhar (Cairo: Maktabat Madbuli, 1993).

১৯৮১ সালের সাদাত হত্যাকাণ্ড প্রশাসন ও মৌলবাদী ইসলামি দলগুলোর মধ্যকার অন্যতম একটি ভয়াবহ ও প্রধান ঘটনা।[২১]

ক্ষমতা পাওয়ার পর সাদাত ইসলামি দলগুলোর প্রতি সহনশীল আচরণ করে। কারণ, তার ঝোঁক ছিল দেশের বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলো দমন করার ওপর। কিন্তু ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে সরকার ইসলামি দলগুলোর প্রতিরোধের কারণে খারাপ সময় পার করছিল। সরকার ভাবছিল, সাদাত হত্যার পর যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে, তাতে করে দলগুলো বিলীন হয়ে যাবে। যায়াত এই কথাটি ঠিক বলেছেন যে, ১৯৭৯ সালে সোভিয়েতের আফগানিস্তান দখলের ঘটনা বিভিন্ন জিহাদি দলকে উৎসাহ দিয়েছে। জাওয়াহিরির মতো পুরো মুসলিম বিশ্বের মৌলবাদী দল বা ব্যক্তিরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়তে আফগানে পাড়ি জমায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা সেখানে শক্তিশালী ইসলামি সশস্ত্র দল গঠন করবে আর পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে সরকারকে উৎখাত করবে। যায়াত তাদের সাথে তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করেন—যারা বলে, জাওয়াহিরি মিশর সরকারের নির্দেশে আফগানে নির্বাসিত হতে বাধ্য হয়েছে। জাওয়াহিরি আফগানিস্তান গিয়েছিল নতুন পরিবেশে তার জিহাদি চিন্তা-ভাবনা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে আর মিশরের গোয়েন্দাদের নজরদারি থেকে বাঁচতে। যায়াতের মতে, "জাওয়াহিরি ও তার অনুসারীরা আফগানিস্তানে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে। কারণ, তাদের কাছে সেখানকার পরিবেশ জিহাদের জন্য উপযুক্ত মনে হয়েছে।"

আল-জিহাদ, আল-কায়েদা আর আমেরিকা হামলা বিষয়ে যায়াতের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো—আমেরিকা হামলার পেছনে যে আল-কায়েদাই জড়িত এ বিষয়ে যায়াতের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আরব ও মুসলিম বিশ্বের অনেকেই মনে করে, সেপ্টেম্বরের হামলা আল-কায়েদা বা কোনো ইসলামি দল করেনি, বরং এই কাজের সাথে CIA বা ইসরায়েল জড়িত। যায়াত বোধ হয় এ বিষয়ে কোনো বিতর্কই করতে

---

২১. জানতে দেখুন, Mohammed Haykal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat, tr. André Deutsch (London 1983).

চান না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হামলার পেছনে জাওয়াহিরি মূল হোতা। আর এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। যায়াত তার এই বিশ্বাস সত্য প্রমাণ করতে জাওয়াহিরির বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ঝোঁকের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর প্রবণতা জাওয়াহিরির মধ্যে আগে থেকেই ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৮০ এর দশকে জাওয়াহিরির হিংস্রপন্থা অবলম্বনের কথা যায়াত উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা আফগানিস্তানে যাওয়ার আগেই বিকশিত হয়েছিল। আফগানিস্তানে বিন লাদেনের সাক্ষাৎ ও তার সাথে বন্ধুত্বের কারণে জাওয়াহিরি পুনরায় জিহাদি দল গঠন করতে সক্ষম হয়। যায়াত এই বিষয়টিও এনেছেন যে, বিন লাদেন যেমন জাওয়াহিরিকে প্রভাবিত করেছে, জাওয়াহিরিও তেমন বিন লাদেনকে প্রভাবিত করেছে।

যদিও জাওয়াহিরি বিন লাদেনের মতো বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, আবার বিন লাদেনও জাওয়াহিরির মতো বিচক্ষণ চিন্তা-ভাবনা ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু দেশি-বিদেশি শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর বিষয়ে উভয়ের মাঝে ঐক্য ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে আসা দুজনেরই একটাই লক্ষ্য ছিল—ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিন লাদেনের কাছে আরব উপদ্বীপে আমেরিকার উপস্থিতি ছিল অভিশাপের মতো আর ইসরায়েল ও জায়ানিজমের প্রতি আমেরিকার সহযোগিতা ছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই বিষয়গুলোই বিন লাদেনের কর্মকাণ্ডের পেছনের কারণ। জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে তার 'বৈপ্লবিক জিহাদি মতবাদ' দ্বারা প্রভাবিত করেছিল। যার কারণে দাতব্য কাজে জড়িত থাকা একজন সালাফি দাঈ (দ্বীন প্রচারক) বিন লাদেন, আমেরিকা আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডুবে থাকা যোদ্ধায় পরিণত হয়। তাছাড়াও জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে *মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ* দলের এমন কিছু নেতাদের মাধ্যমে ঘিরে রেখেছিল, যারা জাওয়াহিরি ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ড সম্মান করত।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে ক্ষমতায় বসা ও ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের বেশিরভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তালিবান দলটি জাওয়াহিরির দলকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ভীষণ সাহায্য করে। সোভিয়েতকে তাড়ানোর পর বিভিন্ন দল আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিল। তাদের ব্যর্থতার পর তালিবান ক্ষমতা দখল করে। তালিবানের উত্থানের কারণ, তাদের প্রতি পাকিস্তানের অস্বাভাবিক সহযোগিতার বিষয়ে যায়াত খুব একটা আলোচনা করেননি। যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন, জাওয়াহিরি তালিবানের কাজকর্মে এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, মহিলাদের বাড়ির বাইরে কাজ করার বিষয়ে তালিবানের নিষেধাজ্ঞার প্রতিও সমর্থন জানিয়েছিল। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, জাওয়াহিরি মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে তার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আর ক্ষমতা দখল নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। নিচের বিষয়গুলোই সম্ভবত তালিবানের সাথে বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির মিত্রতার কারণ:

(১) তালিবানের রক্ষণশীল চিন্তাধারা

(২) তাদের প্রতি বিন লাদেনের অর্থনৈতিক সাহায্য

(৩) সোভিয়েত জিহাদে তাদের ভূমিকা।

বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পর্ক বা লেনদেনের ক্ষেত্রে তালিবান আল-কায়েদা দলটির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সোভিয়েত অপসারণের পর ও সোভিয়েতের বিভক্তির পর বিশ্বরাজনীতিতে আফগানিস্তানের অবস্থান কেমন সে সম্পর্কে তাদের ভালোই ধারণা আছে। উপরন্তু, মিশরীয় ইসলামি জিহাদ দলের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল দিতে গিয়ে তালিবান অন্যান্য ইসলামি দলের (সশস্ত্র বা অস্ত্রহীন) সদস্যদের জন্যও আফগানিস্তানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। এমন দলের মধ্যে অন্যতম হলো জামাআ আল-ইসলামিয়া। প্রশাসনকর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে এই দলের নেতারা স্বদেশে ফিরতে পারছিল না। যাহোক, যায়াত উল্লেখ করেছেন, তালিবানের অধীনে ইসলামি জিহাদ দলের সদস্যরা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছিল। যার ফলে তাদের প্রতি অন্য দলগুলোর মনে বিদ্বেষ জন্মে।

আফগানিস্তানে অবস্থানগত সুবিধার কারণে জিহাদ সংগঠনটি উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। এমনকি জাওয়াহিরি মিশরের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ১৯৯০ দশকে হত্যা-চেষ্টার ঘটনাগুলো মিশরকে ব্যাপক নাড়া দেয়। সম্ভবত বিন লাদেনের থেকে পাওয়া বেশিরভাগ অর্থ জাওয়াহিরি এই কাজেই লাগিয়েছিল। মিশরের বিশিষ্ট নেতাদের টার্গেট বানাতে জাওয়াহিরি দেশী শত্রু আর বিদেশি শত্রুর পার্থক্য করেনি। ১৯৯০ এর মাঝামাঝি 'জেরুসালেমে যেতে হলে কায়রো, তিউনিসিয়া আর আলজেরিয়ার রাস্তা পাড়ি দিতে হবে' এই নীতি মেনে দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রতি তার বেশি আগ্রহ ছিল। যার কারণে ১৯৯৬ সালে ইহুদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদ ফ্রন্টে জাওয়াহিরি যুক্ত হলে যায়াত অবাক হয়ে যান। তিনি সে কথা তার বইয়ে এনেছেন। নিঃসন্দেহে মিশরে তার দলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও দলের বহু সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় জাওয়াহিরি এমন একটি যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

বইটির শেষের দিকের অংশটি বেশ আকর্ষণীয়। সেখানে যায়াত জাওয়াহিরির করা মূলধারার ইখওয়ানের সমালোচনা ও মিশরে রক্তপাত বন্ধে সন্ত্রাসের বিপরীতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নেওয়ায় যায়াতের সমালোচনা করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২২] জাওয়াহিরি যায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তিনি ইসলামের শত্রু, আমেরিকা আর ইসরায়েলের দালাল। এই ঘটনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত জাওয়াহিরির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতি ঝোঁক অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। যায়াতের মতে, জাওয়াহিরির আন্তর্জাতিক ফ্রন্টে যোগ দেওয়া ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ার পেছনে জাওয়াহিরির অপরিণামদর্শী চিন্তা-ভাবনা দায়ি। এই ফ্রন্ট গঠনের সময় জাওয়াহিরির জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের সাথে পরামর্শ না করেই তাদেরকে ফ্রন্টে শামিল

---

২২. আরও দেখুন, Ayman al-Zawahiri, al-Hasad al-murr: al-Ikhwan al-Muslimun fisitin 'am (Dar al-Bayariq, 2002).

করে। "জাওয়াহিরির ভুলের মাশুল অন্য ইসলামিস্টদের দিতে হয়েছিল" শিরোনামে যায়াত ৯/১১ হামলার পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও ইসলামি আন্দোলনের অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, আমেরিকা হামলা হচ্ছে প্রধানত রাগ, উগ্রতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের ফসল। এই হামলা করার সময় এর দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাবের চেয়ে হামলার সাময়িক ক্ষতিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাওয়াহিরির অসতর্কতা, মূলধারা বা বিচ্ছিন্ন সবধরনের ইসলামিক দলগুলোকে দেশে-বিদেশে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমেরিকা ও ইসরায়েল আরব ও মুসলিম বিশ্বের শত্রু—এ বিষয়ে যায়াত, জাওয়াহিরি ও বিন লাদেনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন না সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো অর্জন এনে দিতে পারে। বরং এ ধরনের হামলা সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও তার মিত্রদের আরব ও মুসলিম বিশ্বের ইসলামিক দলগুলো সমূলে উৎখাত করার সুযোগ করে দেয়। যেই ইসলামিস্টরা জিহাদি দলের সদস্য ছিল না কিন্তু স্বদেশের রাজনৈতিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকেও আমেরিকার আগ্রাসনের শিকার হতে হলো। তারা এমন যুদ্ধে নিজেদের আবিষ্কার করল যেটার সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। এমনকি এই যুদ্ধের কারণে তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করল আবার কেউ বা হলো কারাবন্দী।

যায়াত বর্তমান আরব ও মুসলিম বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে নির্দেশ করেছেন, এই ইসলামি আন্দোলন কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে? একজন আইনজীবী হিসেবে যায়াত বিশ্বাস করেন না দমন-পীড়ন কোনো সমাধান হতে পারে। অন্যদিকে ৯/১১ এর দুঃখজনক ঘটনার পর মুসলিম বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকরা যেন বিভিন্ন ইসলামিক দল, বিরোধী ও ধর্মীয় দলগুলোর ওপর আরও বেশি নিপীড়ন চালানোর বৈধতা পেয়েছে। আমি মনে করি, যে কারও উচিত, আরব ও মুসলিম সমাজে সন্ত্রাসের গোড়ার দিকটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু যায়াত এ বিষয়ে খুব একটা কথা বলেননি। পরিষ্কারভাবে বললে, আরব ও মুসলিম বিশ্ব এমন ভয়াবহ সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক জটিলতায় জর্জরিত হয়েছিল; যার ফলস্বরূপ জামাআ আল-ইসলামিয়ার মতো সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর উত্থান ঘটে। আরব বিশ্বে স্বৈরাচারী শাসকদের আরও শক্তিশালী হওয়া, মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বাড়তে থাকা বিশাল ব্যবধান সন্ত্রাসকে পুরোপুরি দমন করতে পারবে না কিন্তু ধীরে ধীরে এর পঁচন হয়তো ঘটাতে পারবে। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, বুশ প্রশাসনের ঘোষিত ওয়ার অন টেরর এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। ইরাকে আমেরিকার দখলদারিত্ব মুসলিম বিশ্বের উগ্রবাদী দলগুলোর উগ্রতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই বইটি আমেরিকা এবং মৌলবাদী ইসলাম সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। বর্তমানে একটি কথা প্রচলিত আছে, John Cooley এর ভাষায়, সোভিয়েতের আফগানিস্তান আক্রমণ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা "দারুণভাবে মৌলবাদী ইসলামের প্রেমে পড়েছে।"[২৩] আমেরিকা, মিশর, সৌদিআরব, পাকিস্তানসহ অনেক মৌলবাদী দল একত্র হয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। একদিক থেকে, আফগান যুদ্ধ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙতে ব্যবহৃত দাবার গুটি। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তির দিকে নিয়ে যায় আর কোল্ড ওয়ারের পতন ঘটায়। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় জয়ের দিকে এগিয়ে যায় পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশগুলো। এই কারণে যুদ্ধের পর আফগানিস্তানকে একাই নিজের ক্ষত সারার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। পাকিস্তান আর কয়েকটি ইসলামি দল ছাড়া সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সাহায্য করা কোনো দেশই যুদ্ধের পর তার পাশে ছিল না।

---

২৩. John K. Cooley, Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism, second edition (London: Pluto Press, 2000), 1–3. কুলির মতে, আফগানিস্তানে বিভিন্ন মুজাহিদ দলগুলোতে সৈন্য সরবারহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানে CIA একটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ইউএস স্পেশাল ফোর্সেস এবং একত্রিত বিবিধ স্বজাতীয় বিশেষজ্ঞগণ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করত। পাকিস্তানের সংগঠন ISI, সেখানের বিভিন্ন স্কুল এবং ক্যাম্পে এক ঝাঁক মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ময়দানে প্রেরণ করত; যদিও প্রায়ই ISI-এর বিভিন্ন শাখা অস্ত্রশস্ত্র বিন্যাস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে নিযুক্ত হতো। (Ibid., 81)

আপাত দৃষ্টিতে বলাই যায় যে, আমেরিকায় হামলা করার যথেষ্ট পূর্বাভাস দেওয়া স্বত্বেও মার্কিন প্রশাসন তেমন কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়নি। বেশিরভাগ মানুষেরই এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। এ বিষয়ে Cooley বিশ্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য যুগান্তকারী তথ্য সামনে এনেছেন—

> বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া বা এর চেয়ে কম শক্তিশালী দেশগুলোর ভবিষ্যতের সরকারকে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেই লোকগুলোকে একটু ভালো করে দেখে নিন যাদের আপনি বন্ধু, সহযোগী বা ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভালো করে দেখে নিন, আপনার সহযোগীরা আপনার পেছনে আঘাত করার জন্য খাপ থেকে তাদের ছুরি বের করছে কিনা।[২৪]

এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বই ইংরেজি ভাষায় সঙ্কলন করার জন্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ কায়রোর মি. আহমেদ ফেকরি ও সারা নিমিস অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। ইংলিশ লাইব্রেরিতে ইসলামি আন্দোলন সম্পর্কে লেখা নিম্নমানের অনেক বই আছে। বক্ষমান বইটি বর্তমান ইসলামিজম সম্পর্কে লেখা গুরুত্বপূর্ণ একটি বই, কারণ এটা কোনো বাইরের মধ্যস্থতাকারী লেখেননি। এর সাথে জড়িত ব্যক্তিই লিখেছেন।

২৪. Ibid, 247 (ইতালিয়ান সংযুক্তি)

একজন অভিজাত মৌলবাদী

৪ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে 'মহান জিহাদ' নামে বিখ্যাত কেসের তদন্ত বিষয়ে উচ্চ আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাসর সিটি এক্সিবিশন সেন্টারের বড় একটি হলরুমে আনা হয়েছিল ৩০২ জন অভিযুক্ত ইসলামিস্টকে। সাংবাদিক দিয়ে ভর্তি ছিল হলরুমটি, তারা সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কভার করতে এসেছিল যেটা পুরো মিশরকে নাড়া দিয়েছে—রাষ্ট্রপতি আনোয়ার আল-সাদাত হত্যাকাণ্ড। বিশেষভাবে তারা এর পেছনে যারা আছে তাদের দেখতে এসেছিল। তখন আয়মান আল-জাওয়াহিরি, শহিদ এসাম আল-ক্বামারি[২৫] সবেমাত্র Citadal Prison থেকে এসেছেন। এই দুজন মুখ খুলল অভিযুক্ত সদস্যদের ওপর চালিত নির্যাতনের বিষয়ে। জাওয়াহিরি বলে চলল রাষ্ট্রপতি সাদাতের হত্যার মাসে জেলখানায় কী নির্মম অত্যাচার চলছিল। উদাহরণস্বরূপ সে এক যুবকের কথা বলল, যাকে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে। সেল নং ৩ হিসেবে পরিচিত সেই সেলটির সাথে ফরাসি জেলখালার তুলনা করা যায়। দুই দেশের জেলের মাঝে যেন গভীর মিল। শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের ক্ষেত্রেই নয়, বন্দীদের ওপর চালিত অত্যাচারের দিক থেকেও অনেক মিল।

যদিও Citadal Prison কায়রোর মধ্যস্থলে অবস্থিত, কিন্তু অভিযুক্ত কারাবন্দিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। জাওয়াহিরি নিজেও এই জেলে কয়েকমাস ছিল, কোর্ট তদন্ত শুরু করলে তাকে অন্য জেলে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে জওয়াহিরি, এসাম আল-ক্বামারির সহায়তায় সেই যুবকের, মানে আমার স্থানান্তরের দাবি করে।

---

২৫. ক্বামারি জাওয়াহিরির সমসাময়িক ব্যক্তি ছিল। সশস্ত্রভাবে মিশর সরকারকে উৎখাত করার জন্য আর্মিতে যোগ দেয়। শেষপর্যন্ত, অত্যাচারের কারণে জাওয়াহিরি তার অবস্থানের কথা প্রশাসনের কাছে প্রকাশ করেছিল। মিশর প্রশাসন তার ফাঁসির আদেশ দেয়।

আমার সাথে সাক্ষাৎ না হলেও জাওয়াহিরি আমার জন্য যা করেছে তা আমি কখনও ভুলব না। পরবর্তীতে তার সাথে তোরাতে যখন দেখা হয়েছিল তখন আমাকে সহযোগিতার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম, যা আমাকে কারাগারের চার দেয়ালে পাওয়া নির্যাতন আর একাকীত্বের যন্ত্রণা ভুলতে সাহায্য করেছে। সেসময় আমি অনুভব করেছিলাম জাওয়াহিরি আর আমার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ কিছুর সাক্ষী হতে যাচ্ছে। পরবর্তীতে আমার ধারণা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না, অপরিচিত আমাকে যে লোকটি একদিন সহানুভূতি দেখিয়েছিল সে একদিন নিজেকে পৃথিবীর মোস্ট ওয়ান্টেড লোকদের একজন হিসেবে আবিষ্কার করবে।

* * *

অনেক বছর ধরে আমি নিজেকে তার ইতিহাস অনুসন্ধানরত আবিষ্কার করেছি। বিভিন্ন ঘটনা হাতড়ে বেরিয়েছি; ভেবেছি, সেগুলো তার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমি তার অতীত অন্বেষণ করেছি; ভেবেছি, আজকে সে নিজের জীবনে যে দুর্ভোগ ডেকে এনেছে, সেগুলো তার বদলে যাওয়ার কারণ বলতে পারবে। আমি এই মানুষটির ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি, যার সিদ্ধান্ত একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের গঠন বদলে দিয়েছে।

আয়মান আল-জাওয়াহিরি ১৯৫১ সালে কায়রোর মাদি[২৬] নামক শহরতলীর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এখনও তার বংশ কায়রোর সবচেয়ে সম্মানিত বংশ হিসেবে পরিচিত।

জাওয়াহিরি এবং আযযাম নামক বিখ্যাত দুই পরিবারের সন্তান এই আয়মান আল-জাওয়াহিরি। বই পড়ার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল। ছোটবেলা থেকেই তার বই পড়ার আগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার কৃতিত্ব এবং অধ্যবসায় তার পরিবারের নজরে এসেছিল। যখন সে

---

২৬. কায়রোর কাছের এক সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল, অসংখ্য নির্বাসিত ব্যক্তির বসবাসের জন্য পরিচিত।

পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখনও সে তার বয়সী অন্য বাচ্চাদের মতো খেলাধুলা করে বা টেলিভিশন দেখে সময় কাটাত না; বরং ধর্মীয় বই কিংবা ফিকহের বই পড়ে অবসর সময় কাটাত। বই পড়ায় নিজেকে অন্তর্মুখ করে রেখেছিল বলে তার সম্পর্কে বলার জন্য ছোটবেলার কোনো বন্ধু পাওয়া যায় না। তারপরও সহকর্মী, স্কুলের সহপাঠী এবং প্রতিবেশীরা তার প্রশংসা করে। জাওয়াহিরি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে কাওমিয়্যা স্কুলে। তারপর হাইস্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করে মাদি স্কুলে। শৈশব এবং তারুণ্যের শুরুতে সে সাহিত্য এবং কবিতা ভালোবাসত। তার বয়সী ছেলেদের জন্য বিষয়টি বিরল। তাছাড়া বিখ্যাত মাদি স্পোর্টিং ক্লাব তার বাসার কাছেই ছিল। কিন্তু সে সেখানে যোগ দেয়নি। জাওয়াহিরি মনে করত যে খেলাধুলা, বিশেষ করে বক্সিং এবং রেসলিং অমানবিক খেলাধুলা। এসব কারণে যারা তাকে চেনে তারা তাকে স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয়ের অধিকারী বলে মনে করে। এমনকি শৈশবেও জাওয়াহিরির চরিত্রে কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না। অপরদিকে সে চাইতও না তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ করার সুযোগ পাক। যেসব বিষয় সে বুঝতে পারত না, খুশিমনে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইত। কখনও তর্কের খাতিরে যুক্তি দিত না। বিনয়ের সাথে অন্যের কথা শুনত কিন্তু নিজের কর্তৃত্ব কারও হাতে দিত না। শক্ত যুক্তি থাকার পর সে বিনয়ী আচরণ করত। লাইমলাইটে আসার বা নেতৃত্ব পাওয়ার ইচ্ছে তার মধ্যে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সে যখন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছিল তখন মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির ভরা মৌসুম চলছিল। কিন্তু ছাত্র অবস্থায় সে কোনো ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনে যুক্ত হয়নি। সেসময় দাওয়াহ[২৭]-ও বেশ জোরেশোরে চলছিল। জাওয়াহিরি সে কাজেও উদ্যমী হয়নি। সে এতই নিরহংকার ছিল যে, যেই জিহাদি দল সে নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটারও নেতা হতে চায়নি। এটি ১৯৮৭ সালের কথা, তখন সে পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থান

২৭. আক্ষরিক অর্থে 'আহ্বান করা', মানে তখন ইসলামিস্টরা অন্যান্য মিশরীয়দের গোঁড়া ইসলামের দিকে ডাকত।

করছিল। এই দলের শুরুর দিকে সে এর নেতৃত্ব তুলে দেয় তার বন্ধু সৈয়দ ইমাম আব্দেল আযীযের[২৮] হাতে।

আয়মান আল-জাওয়াহিরি ধার্মিক মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করে। বাবার অনুসরণ করে সে শুধু সময়মতো নামাজ আদায় করে ক্ষ্যান্ত হয়নি, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত সে। সে হোসাইন সাদকি মসজিদে যেত, এটা তার বাসার কাছে ছিল। জাওয়াহিরি ফজরের নামাজ মসজিদে আদায় করা থেকে কখনও বিরত থাকতে চাইত না, এমনকি প্রবল শীতেও। মসজিদে আয়োজিত কুরআনের তাফসির, ফিকহ এবং কুরআন তিলাওয়াতের ক্লাসগুলোতে সে উপস্থিত থাকত। জাওয়াহিরি মোস্তফা কামাল ওয়াসফির লেকচারগুলোতে সবসময় উপস্থিত থাকত। ওয়াসফি সেসময় সেন্ট্রাল কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি 'আল-ইসলাম আল-তানউইরি' (আলোকিত ইসলাম) বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। জাওয়াহিরি তার বাবার মতো পড়তে ও জ্ঞান আহরণ করতে ভালোবাসত। বিশেষ করে সার্জারি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ ছিল। মায়ের মতো সে নামাজ আদায় করতে, কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং ধর্মীয় বই পড়তে ভালোবাসত। জাওয়াহিরি যেসব বই পড়ত, মসজিদে যেসব ক্লাস করত সেগুলো নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করে ছিল না। সেই একই বইগুলো প্রায় প্রতিটি সাধারণ মিশরীয় পড়ে থাকে। যারা জাওয়াহিরিকে চেনেন তারা বলেন, শুধু একজন মহিলার সাথে জাওয়াহিরির সম্পর্ক ছিল আর সেই মহিলা হলেন তার স্ত্রী আজ্জা আহমেদ নুওয়াইর। নুওয়াইর কায়রো ইউনিভার্সিটির কলা বিভাগ থেকে দর্শনে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে অপেরা স্কোয়ারের কন্টিনেন্টাল হোটেল তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কন্টিনেন্টাল হোটেল সেই সময়ের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ হোটেলের একটি ছিল। যেহেতু তারা রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের লোক ছিলেন, তাদের বিয়েতে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা

---

২৮. আব্দেল আযীয জাওয়াহিরির মাধ্যমে দলে ঢুকেছিল এবং তার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। সে ১৯৮৫ সালে জাওয়াহিরির সাথে মিশর ত্যাগ করে।

স্থানের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিল, এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না যে সে কোনো গোপন সশস্ত্র সংগঠনকে নেতৃত্ব দেবে। তার সুন্দর চরিত্র কখনও ইঙ্গিত দেয়নি যে সে পৃথিবীর মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের একজন হবে। আমেরিকার হাত থেকে বাঁচতে হয়তো এই মুহূর্তেও সে আফগানিস্তানের গুহায় গুহায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

* * *

জাওয়াহিরি ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষে কায়রো ইউনিভার্সিটির মেডিসিন বিভাগে ভর্তি হয় এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী হয়ে ১৯৭৪ সালে স্নাতক শেষ করে। এরপর কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে সার্জারি বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৭৮ সালে। পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থানের সময় সার্জারিতে পিএইচডিও সম্পন্ন করে।

১৯৮১ সালের ২৩ অক্টোবর যখন সে গ্রেফতার হয়, তখন বেরিয়ে আসে যে, ১৬ বছর বয়স থেকে সে একটি গোপন দল পরিচালনা করে আসছে। সে যখন আটক হয় তখন এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ জন। শাসকগোষ্ঠী আবিষ্কার করে, জাওয়াহিরি সেই দলের সদস্যদের ইসলামের আদর্শিক এবং গঠনমূলক শিক্ষা দিত। যার কারণে তারা শাসকগোষ্ঠীর ওপর তাকফির (কাউকে ইসলামচ্যুত ঘোষণা করা) প্রবণ হয়ে উঠে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিষয়ে তার যে মানদণ্ড ছিল সেটা সেই গোপন দলের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য সে অন্য জিহাদি[২৯] দলকেও সহযোগিতা করত।

---

২৯. যেসব জিহাদি দল মনে করে যেসব সরকার ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়ন করে না তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাওয়াহিরির দলের সদস্য

সৈয়দ ইমাম আব্দেল আযীয (ড. ফাদল বা আব্দেল কাদের আব্দেল আযীয হিসেবে পরিচিত) যখন আফগানিস্তানে যায় তখন জাওয়াহিরির সাথে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। সে জাওয়াহিরির সাথে অনেক বৈঠকে উপস্থিত ছিল। যেমন—সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর আবদুল যোমরের[৩০] সাথে তারা বৈঠক করে যেন আর কোনো অপারেশন না চালানো হয়। ১৯৮৫ সালে আব্দেল আযীয মিশর ত্যাগ করে। একই বছর জাওয়াহিরিও মিশর ছেড়ে চলে যায়। পেশোয়ারে গিয়ে আব্দেল আযীয ইসলামিক জিহাদ[৩১] দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং জিহাদ ক্যাম্প[৩২] গড়ে তোলে।

আমীন ইউসুফ আল-দোমেইরি একজন ফার্মাসিস্ট ছিল। সে জাওয়াহিরির দলকে আর্থিকভাবে সাহায্য করত। নিজের ফার্মেসি থেকে উপার্জিত অর্থ দলে দান করত। সে কিছু ধর্মীয় ক্লাসও নিয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দেল রাহীম আল-শারক্বাউঈ দলে সদস্য ঢোকানোর কাজ করত। কায়রোর গামালিয়্যা জেলায় সে একটা চামড়া কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কারখানা থেকে অর্জিত অর্থ সে দলের কাজে লাগাত। ১৯৮১ সালে আর্মি থেকে পালানোর পর এসাম আল-ক্বামারি লুকিয়ে থাকার জন্য এই কারখানাটা ব্যবহার করেছিল।

---

৩০. যোমর পরিবারের একজন সদস্য, যে কায়রোর কাছাকাছি নাহিয়া গ্রামে থাকত, আব্বুদ যোমর ইজিপশিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার ছিল।

৩১. বিভিন্ন দলের সাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় এই দলটি গড়ে ওঠে। এর নাম আসলে জিহাদ সংঘ। ফিলিস্তিনের জিহাদ সংঘের সাথে পার্থক্য করার জন্য একে মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ দলও বলা হয়। পরবর্তীতে ইসলামিক জিহাদ বলতে আফগানে জাওয়াহিরির প্রতিষ্ঠিত দলটিকে বুঝানো হয়েছে।

৩২. আফগানিস্তানে জিহাদি গ্রুপগুলো তৈরি করা হয়েছিল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

খালেদ মেধাত আল-ফিক্বি তার মাদি এলাকার ফ্ল্যাটটি দলের অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিল। এসাম আল-ক্বামারি, খামিস মুসলিম এবং মোহাম্মদ আল-আসওয়ানিকে তোরা কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করার দায়ে ১৯৮৮ সালে খালেদ মেধাতকে অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে মিশরে অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা করার দায়ে জাওয়াহিরির ভাই মোহাম্মদ আল-জাওয়াহিরির সাথে তাকেও অভিযুক্ত করা হয়।

সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর খালেদ আব্দেল সামীকে মাদি শহরে গ্রেফতার করা হয়। সেবার প্রশাসন তার কাছ থেকে ব্যাগভর্তি বোমা জব্দ করে। এটাই ছিল প্রথম সূত্র যেটা জাওয়াহিরির সাথে এসব কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা নির্দেশ করেছিল।

মোহাম্মদ আল-জাওয়াহিরি ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৮১ সালে তার ভাই আয়মান তাকে মিশর ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে থাকে, বাইরে গিয়ে দলের জন্য অর্থনৈতিক উৎস খোঁজার জন্য। যে বছর সাদাত মারা যায়, সে বছর মোহাম্মদ আরব উপদ্বীপের একটি দেশে কাজ করছিল। অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়, পরবর্তীতে এই অভিযোগ থেকে মুক্তিও দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে পুনরায় তার অনুপস্থিতিতে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। মিডিয়ায় এই কেসটি 'আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন'[৩৩] নামে পরিচিত। এই কেস সম্পর্কে এই বইয়ের আরেক জায়গায় আলোচনা করেছি। পরে তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকরা বলে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০০০ সালে তাকে মিশরের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু মিশরীয় প্রশাসন এ বিষয়ে কিছু বলেনি।

এসাম আল-ক্বামারি ছিল একজন মিশরীয় আর্মি অফিসার। জাওয়াহিরি এবং সেনাবাহিনীর ভেতরে থাকা একটি দলের মাঝে সে

---

৩৩. এই কেসে ইসলামি জিহাদ দলের ১০০ এরও বেশি সদস্যদের আলবেনিয়ার গ্রেফতার করা হয়েছিল ও দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এই কেসে জাওয়াহিরির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়।

লিংক বা সংযোগ হিসেবে কাজ করত। বইয়ের একটি অংশে তার ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আরও কয়েকজন সদস্যের নাম ইউসুফ আব্দেল মাজিদ, এসাম হেনদাউঈ, মোস্তফা কামাল মোস্তফা, আব্দেল হাদি আল-তুনসি এবং নাবীল আল-বোরাই। নাবীল ছিল মাদির একটি বইয়ের দোকানের মালিক।

সাদাত হত্যাকাণ্ডের আগে বিভিন্ন দল

১৯৮১ সালে সাদাত হত্যার পূর্বেই বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপের উত্থান চোখে পড়ছিল। নীতিশাস্ত্র এবং পরিবর্তন আনার পন্থা নিয়ে মতপার্থক্য থাকায় একাধিক দল তৈরি হচ্ছিল। ১৯৭৯ সালে আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন[৩৪] বা Muslim Brotherhood লোয়ার ইজিপ্টে[৩৫] শিক্ষার্থীদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো। আব্দেল মনিম আবু আল-ফতুহ, ড. এসাম আল-ইরিয়ান এবং ড. ইব্রাহিম আল-জাফারানি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও উপরে বর্ণিত জাওয়াহিরির দলের মতো বিভিন্ন জিহাদি দলও গড়ে উঠছিল।

আপার ইজিপ্টের[৩৬] বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের অংশগ্রহণে জামাআ আল-ইসলামিয়া নামের সংঘ গড়ে উঠেছিল। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মেনয়া, বেনি সুফ, সুহাজ, আস সাউত, কেনা, আসওয়ান, কায়রো ইউনিভার্সিটি অন্যতম। এই দলটি কারাম যোহদিসহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। যেমন—ওসামা হাফেয, সালাহ হাশিম, তাল'আত ফউ'আদ কাসেম, নেগাহ ইবরাহিম, এসাম দেরবালাহ, রেফাই তাহা এবং হামদি আব্দেল রহমান। আপার ইজিপ্টের দুজন বিখ্যাত নেতা জামাআ আল-ইসলামিয়া ছেড়ে মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগ দেন। তারা হলেন—মহী আল-দীন ইসা এবং আবু আল-ইলা মাদি।

---

৩৪. ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড, সেক্যুলার সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মিশরের প্রথম দল। যদিও এটি মিলিটারি গ্রুপ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল বর্তমানে এটি অন্যতম মডারেট ইসলামি দলে পরিণত হয়েছে।

৩৫. মিশরীয় বদ্বীপও বলা হয়, লোয়ার ইজিপ্ট নীলনদ বিধৌত একটি এলাকা, নীলনদের এই শাখাটি কায়রোর উত্তর দিকে দিয়ে কায়রোতে প্রবেশ করেছে।

৩৬. আপার ইজিপ্ট, এটা সাঈদ নামেও পরিচিত, নীলনদ বিধৌত এলাকা, কায়রোর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

মোহাম্মদ আব্দেল সালাম ফারাগের দল বৌলাক, নাহিয়া এবং কারদাসা[৩৭] এলাকায় জনপ্রিয় ছিল, সেই এলাকায় মূলত এর প্রতিষ্ঠা এবং নামকরণ হয়। ফারাগ নিজে অন্য একটি বিখ্যাত জিহাদি গ্রুপের দুজন ইসলামিস্টের বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ইসলামিস্ট দুজনের নাম ইয়াহিয়া এবং মাজদি ঘারীব ফায়াদ। নাহিয়া গ্রামে যোমর পরিবারের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, যেখানে ফারাগের দল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আববুদ এবং তারিক আল-যোমর দুজনই সেখানে থাকত। যোমর বংশের অন্য লোকেরা কায়রোর বিভিন্ন শহরতলীতে বসবাস করত। যেমন—আইন শামস, যেখানে নাবীল আল-মাগরেবি, হুসাইন আব্বাস এবং আব্দেল হামিদ আব্দেল সালাম বসবাস করতেন। লোয়ার ইজিপ্টেও তাদের প্রভাব ছিল। যেমন—বাহেইরা,[৩৮] সেখানে আতা তায়েল হামীদা রাহেল বসবাস করতেন।

মোহাম্মদ সালেম আল-রাহাল ছিলেন ফিলিস্তিন-জর্ডান বংশোদ্ভূত, তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে[৩৯] পড়াশোনা করছিলেন তখন। তিনি নিজে একটি দল গঠন করেন এবং অন্য জিহাদি দলগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে ভূমিকা রাখেন। তার কর্মকাণ্ড প্রশাসন জানতে পারলে তাকে গ্রেফতার করে এবং ১৯৮০ সালের মে মাসে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। সালেম আল-রাহাল ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আমার দোবরেইহ স্ট্রিটের বাসায় আমার সাথে দেখা করতে আসত। কায়রো শহরের অন্য জায়গাতেও আমরা দেখা করতাম। শেষবার, শুবরার[৪০] একটি মসজিদে আমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেটা ১৯৮০ সালের কথা। আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখা সময়েই আমি সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু

---

৩৭. কায়রোর পাশের একটি গরিব শহরতলী।

৩৮. রাহিল সাদাত হত্যাকারীদের একজন ছিল।

৩৯. পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আল-আজহার সুন্নিদের জন্য অন্যতম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটাতে আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ে পড়াশোনারও সুযোগ রয়েছে।

৪০. কায়রোর কাছের জনবহুল একটি শহর। শুরবা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকের বসবাসের জন্য পরিচিত।

তাকে দেখতে পাইনি। পরে আমি জানতে পারি, সে মিশর ছেড়ে চলে গেছে। তার চলে যাওয়ার পর কামাল আল-সাইয়্যাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন।

সাদাত হত্যা

১৯৭৯ সালে মোহাম্মদ আব্দেল সালাম ফারাগ নিজ নেতৃত্বে ছোট ছোট জিহাদি দলগুলোকে একত্র করতে সক্ষম হন। ১৯৮০ সালে তিনি জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতা কারাম যোহদির সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি করে যে সকল জিহাদি দল জামাআ আল-ইসলামিয়ার সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে। সম্মিলিত এই গ্রুপটির নেতৃত্বে ছিলেন শায়েখ ওমার আব্দেল রাহমান। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আসসাউত শাখার উসূল আল-দীন (ইসলামের মূলনীতি) বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। এই জোট ১৯৮১ সালের ৬ অক্টোবর সাদাত হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। একই দিনে সেনাবাহিনী অক্টোবর যুদ্ধের বিজয়[৪১] উদযাপন করছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে আসসাউতে[৪২] জামাআ আল-ইসলামিয়া এবং সরকারি বাহিনীর মধ্যে একটি লড়াই হয়েছিল। দুই দলেরই অধিকাংশ সদস্যের গ্রেফতার হওয়ার মাধ্যমে এই লড়াইয়ের অবসান ঘটে। প্রশাসন এই সদস্যদের তিনটি দলে ভাগ করে।

প্রথম ভাগে ছিল সেসব লোক, যারা মিলিটারি প্যারেডের সময় সরাসরি সাদাত হত্যার সাথে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন খালেদ আল-ইসলামবলি, আব্দেল হামিদ, আব্দেল সালাম, আতা তায়েল হামিদা রাহেল এবং হুসাইন আব্বাস। মোহাম্মদ আব্দেল সালাম ফারাগ—যিনি এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনিও অভিযুক্ত হন। সাথে শায়েখ ওমার আব্দেল রাহমান এবং এমন কয়েকজন ব্যক্তিকেও অভিযুক্ত করা হয়, যারা আগে থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জানতেন এবং বিভিন্নভাবে এ কাজে সাহায্য করেছেন। এই অভিযোগে অভিযুক্ত

---

৪১. ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ, অক্টোবরের যুদ্ধের ফলে ইসরায়েলের সাথে একটি শান্তিচুক্তি হয়, বিনিময়ে ইসরায়েল সাইন উপদ্বীপ মিশরের কাছে হস্তান্তর করে। এর মাধ্যমে প্রথম আরব নেতা হিসেবে সাদাত ইসরায়েলকে স্বীকার করে নেন। এই কাজ ইসলামিস্টদের কাছে অপ্রিয় ঘটনা এবং সাদাত হত্যার অন্যতম কারণ।

৪২. আপার ইজিপ্টের একটি অঞ্চল।

সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৪ জন, সামীর ফাদেলের নেতৃত্বে মিলিটারি কোর্ট[৪৩] গঠনের আগে তারা এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল, সাহায্য করেছিল বা উস্কানি দিয়েছিল। আদালতকর্তৃক এদের পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ড আর বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শায়েখ ওমার আব্দেল রাহমান এবং আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আল-সালামুনিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় গ্রুপের বিচার ভার দেওয়া হয় হায়ার স্টেট সিকিউরিটি কোর্টের[৪৪] হাতে। এই গ্রুপের কেস 'জিহাদ কেস' নামে পরিচিত। ৩০২ জন ব্যক্তিকে এই কেসে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ওমার আব্দেল রাহমান[৪৫], আমেরিকার একটি জেলে তিনি এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছেন।

সেই লিস্টে আরও ছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার আব্দেল আল-যোমর। আপার ইজিপ্টের বিশিষ্ট নেতা; যেমন—কারাম যোহদি, নেগাহ ইব্রাহিম, ফুয়াদ আল-দাওয়ালিবি, ওসামা হাফেজ, তাল'আত ফুয়াদ কাসেম, রেফাই তাহাব, আলি আল-শারিফ এবং হামিদ আব্দেল রহমান। কায়রো এবং লোয়ার ইজিপ্টের নেতাদের মধ্যে ছিলেন আয়মান আল-জাওয়াহিরি, সৈয়দ ইমাম আব্দেল আযীয, সারওয়াত সালাহ শাহাতা, নাবীল নাঈম, আব্দেল ফাতাহ, আয়মান আল-দোমেরি, কামাল আল-সৈয়দ হাবীব এবং রাফেঈ সোরুর। সাদাত হত্যার পরপরই ৮

---

৪৩. সাদাত হত্যার পর মিশরে মিলিটারি কোর্ট গঠন করা হয়েছিল জরুরি আইন প্রণয়নের জন্য, সামরিক আইন প্রণয়নের জন্য। কিন্তু আজও এই কোর্ট বিদ্যমান। মিলিটারি কোর্ট মিশরের সিভিলিয়ান কোর্টের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন: প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির ফরমান অনুযায়ী বিচারের আওতায় আনা হয়, রায় তাড়াতাড়ি প্রদান করা হয় আর আপিল করার সুযোগ থাকে না। একারণে অনেক ইউরোপীয় দেশ মিলিটারি কোর্টকে স্বীকৃতি দেয় না। ফলে মিশরে অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন দেশে আশ্রয় পেয়েছে।

৪৪. স্টেট সিকিউরিটি কোর্টও মিলিটারি কোর্টের মতো তাড়াতাড়ি রায় দেয়। তবে পার্থক্য হলো এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির ফরমান আনা যায়।

৪৫. ২০১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিন কারাগারে মৃত্যু হয়।

অক্টোবর, ১৯৮১ সিকিউরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং এবং বেশ কয়েকটি জুয়েলারি শপে ডাকাতি হওয়ার কারণে কিছু দল ভেঙে গিয়েছিল। অভিযুক্তের খাতায় নাম না থাকা সদস্যরা ভেঙে যাওয়া দলগুলোর নেতৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছিল।

কোনো আসামিকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি, কিন্তু বিশিষ্ট সদস্যদের তিন বছরের জেল দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে জাওয়াহিরিও ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে জাওয়াহিরিকে অভিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকা ১৭০ জন সদস্যকে মুক্তি দেওয়া হয়। জিহাদ কেসের তুলনামূলক কম সাজা এটা প্রকাশ করে যে প্রশাসন জিহাদি কর্মীদের সাথে ঝামেলা এড়াতে চাচ্ছিল।

এবার তৃতীয় গ্রুপেরও বিচার হয়। এই দলের ১৭৮ জনকে জিহাদি মানসিকতা লালন করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। সেসময় এই গ্রুপে আমার নাম ছিল তালিকার শীর্ষে। এই তালিকায় জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামও ছিল। যেমন, মোহাম্মদ শাওকি আল-ইসলামবলি ও আব্দেল আখতার হামমাদ। সেই সাথে বিশিষ্ট জিহাদি ব্যক্তিত্বের মধ্যে মাজদি সালেম ও আদিল আব্দেল মাজেদের নামও ছিল।

এই বিচারকার্য প্রায় দুই বছর ধরে চলছিল, এতে উচ্চতর নিরাপত্তা কোর্ট আমাদের কেস অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়। ফলশ্রুতিতে সব সদস্য মুক্তি পায় আর এই কেস পরবর্তীতে কখনও সামনে আনা হয়নি। এটা আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বার্তা ছিল যে, তারা জিহাদি দলগুলোর সাথে মিটমাট করতে চায়। সেসময় আমরা বিষয়টি বুঝতে পারিনি, ফলে আমরা এই সুযোগটি হাতছাড়া করেছি। এটি আমাদের অনেকের জন্যই প্রথম ধাক্কা ছিল, পরবর্তী এমন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অনেকে গিয়েছে।

অন্যান্য তরুণের মতো জাওয়াহিরিও ১৯৬৭ সালের জুনের পরাজয়ে[৪৬] হতাশ হয়ে পড়ে। এই পরাজয় অনেকদিন পর্যন্ত মানুষকে নাড়া দিয়েছে। এ বিষয়ে জাওয়াহিরি ফুরসান তাহত রায়ে তাল-নাবি বা Knights Under the Banner of the Prophet বইয়ে লিখেছে—

"১৯৬৭ সালের পরাজয় মিশরের জিহাদি আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। জামাল আবদেল নাসেরের অনুসারীরা তাকে শ্বাশ্বত অপারেজয়ের প্রতীক মনে করত। এই পরাজয় তার ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেয়। জিহাদি আন্দোলন বুঝতে পেরেছিল, উইপোকা এই মূর্তি খেয়ে ফেলেছে, এই মূর্তি এখন ভঙ্গুর। ১৯৬৭ সালের পরাজয় বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, বিশ্ব দেখেছিল মূর্তিটি নিজের মুখের ওপর ভেঙে পড়ছে, নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করছে এবং সে তার নাগরিকদের ওপরই নিপীড়ন চালাচ্ছে। জিহাদি আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছিল। কারণ, মানুষজন বুঝতে পেরেছিল, তাদের প্রকাশ্য শত্রু একটি ছোট্ট মূর্তি মাত্র, যেটা প্রচারণা আর নিরীহ মানুষের নির্যাতনের ওপর নির্মিত। ১৯৬৭ সালের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অনেক লোক, বিশেষ করে তরুণেরা তাদের আসল পরিচয়ে ফিরে এসেছিল। তাদের আসল পরিচয় তারা ইসলামি সভ্যতার সদস্য। এই পরিবর্তন এসেছিল ক্রেমলিনের পদচারণার দুই বছর পর। ইসলামি জাগরণ স্বতঃস্ফূর্ত যাত্রা শুরু করে এবং বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচণ্ড গতিতে চলতে শুরু করে। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির পর ইসলামি কার্যক্রম চালু করার জন্য এবং কমিউনিজমের অন্ধকারে ডুবে থাকা প্রায় প্রতিটি সার্কেলের অফিসারদের ফিরিয়ে আনতে অসংখ্য দল দাওয়াহ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক দলগুলোর মধ্যে কিছু ধর্মীয় দলও ছিল, যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও বিধি-বিধান প্রচার করছিল। এই দলগুলোর প্রচারকরা দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচারণা চালাত। ফলে শিক্ষার্থীদের ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বাড়ে।

---

৪৬. ১৯৬৭ সালে মিশরীয় আর্মি সিরিয়া ও জর্ডানের সাথে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধ বাজে ভাবে পরাজয় এনে দিয়েছিল। ইসরায়েল এই তিন দেশের কিছু অংশ দখল করেছিল।

ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কায়রোতে ছিলেন ড. আব্দেল মনিম আবু আল-ফাতাহ, ড. এসাম-আল-ইরিয়ান, আলেকজান্দ্রিয়ায় ড. ইব্রাহিম আল-যাফারানি সেই সাথে কারাম জহদি, নাগাহ ইব্রাহিম আবু আল-আলা মাদি, রাফেই তাহা, মোহাম্মদ শাওকি আল-ইসলামবলি, ওসামা হাফেজ, সালাহ হাশিম ও আহমেদ আল-যায়াত আপার ইজিপ্টে উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকজন লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাওয়াহিরি চোরাগোপ্তার পথ পছন্দ করেছিল।

যাদের মাধ্যমে জাওয়াহিরি প্রভাবিত হয়েছেন

যেসকল ব্যক্তি জাওয়াহিরিকে প্রভাবিত করেছেন, শহিদ সাইয়িদ কুতুব তাদের অন্যতম। কুতুবের লেখা জাওয়াহিরির চিন্তা-ভাবনা গঠনে ভূমিকা রেখেছে। তার লেখা *ফি যিলালিল কুরআন* (*কুরআনের ছত্রছায়ায়*) বইটি জাওয়াহিরির আদর্শ ও কর্মপন্থা নির্ধারণে প্রভাব রেখেছে। এটি আসলে কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, জামাল আবদেল নাসেরের[৪৭] দায়ের করা মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে থাকা অবস্থায় কুতুব এটি লিখেছিলেন। কুতুবের প্রতি জাওয়াহিরির ভালোবাসা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়; কারণ, তার সব বইয়ে সে কুতুবের কথা নিয়ে আসে। *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ে জাওয়াহিরি লিখেছে—

> *সাইয়িদ কুতুব ইসলামের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তাওহীদকে (একত্ববাদ) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারণ, ইসলাম এবং এর শত্রুদের মধ্যে আদর্শিক ভিন্নতার মূল হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ। আসল সমস্যা—ক্ষমতা কার? আল্লাহর এবং তার শরিয়াহর নাকি মানবসৃষ্ট বস্তুবাদী আইনের?*

জাওয়াহিরি কুতুবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে এভাবে—

কুতুবের দল নাসেরের মাধ্যমে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হলেও তরুণ মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। আল্লাহর একত্ববাদ এবং শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া—এই ছিল কুতুবের বার্তা। এ বার্তাই দেশ-বিদেশের ইসলামি বিপ্লবের আগুনকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দিন দিন বিপ্লবের অধ্যায় নতুন করে রচিত হচ্ছে।

জাওয়াহিরির চোখে, সমসাময়িক অন্য লোকদের চেয়ে কুতুবের কথা তরুণ মুসলিমদের বেশি নাড়া দিয়েছে। কারণ, তার কথার কারণে তার ফাঁসি হয়েছে। এভাবেই কথা তার দীর্ঘ এবং মহিমান্বিত জীবনের

---

৪৭. একজন মিশরীয় রাষ্ট্রপতি, পান-এরাবিস্ট মুভমেন্টে তার ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বের জন্য ও মিশর সমাজের আধুনিকায়ন ও আর্থসামাজিক সংস্কারের জন্য বিখ্যাত।

আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে, আবার জীবন শেষও করে দিয়েছে। নাসের প্রশাসন ভেবেছিল যে সাইয়েদ কুতুব এবং তার সাথীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এবং তাদের হাজারো সমর্থকদের আটক করে তারা ইসলামি আন্দোলনের ওপর চরম আঘাত হেনেছে। প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক নীরবতার আড়ালে ছিল অন্য কিছু; কুতুবের দর্শনের ফুটন্ত প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন মিশরের জিহাদি আন্দোলন উত্থানের মূলে ছিল তার শিক্ষা।

জাওয়াহিরির চিন্তায় প্রভাব ফেলেছিলেন এমন আরেকজন ব্যক্তি হলেন 'সালেহ সারিয়া'। সাদাত মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিলে সারিয়া মিশরে আসেন। সেসময় তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেন। যেমন, যায়নাব আল-গাজালি ও হাসান আল-হোদেইবি প্রমুখ। তিনি তরুণদের দল পরিচালনা করেন এবং তাদের শাসকগোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড়াতে তাড়িত করেন। সারিয়া সম্পর্কে জাওয়াহিরির বক্তব্য—

> *একজন ভালো বক্তা, পড়ুয়া, সভ্য ব্যক্তি। আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। ইসলামিক নিয়মকানুনের বিষয়ে তিনি এক সুদক্ষ ব্যক্তি। আমি মাত্র একবার সারিয়াকে দেখেছি মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত ইসলামিক ক্যাম্পে।[৪৮] সেখানে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তার বক্তৃতা আমাকে নাড়া দিয়েছিল। ইসলাম লালন করার শক্তিশালী বার্তা ছিল তার বক্তৃতায়। আমি ঠিক করলাম আমাকে অবশ্যই তার সাথে দেখা করতে হবে। কিন্তু আমার সব চেষ্টা ভেস্তে গেল।*

জাওয়াহিরি তার লেখায় সাদাতের ওপর হানা প্রথম আঘাত তথা টেকনিক্যাল মিলিটারি আঘাতের কথা এনেছে। এটি ঘটেছিল সিরিয়ার

---

৪৮. মিশরীয় ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট করার জন্য সামার ক্যাম্পেইনিংয়ের আয়োজন করে। ইসলামি ছাত্ররা ইসলামি দাওয়াহর প্রসার ঘটাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে।

নেতৃত্বে। এই অপারেশনটি সফল হতে পারেনি। জাওয়াহিরি এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করেছে। তার মতে যে যুবকটি একাডেমির দারোয়ানদের ওপর আক্রমণ করেছিল তার দুর্বল ট্রেনিং আক্রমণ সফল না হওয়ার মূল কারণ। সামগ্রিকভাবে, এই অভ্যুত্থানের নেতারা বাস্তবতা পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। এই অপারেশনের ব্যর্থতা থেকে পাওয়া শিক্ষাটা হচ্ছে—যারা জিহাদ করছিল তারা সোভিয়েত ধরনের নাসেরবাদ[৪৯] আর সাদাতের যুগের পার্থক্য করতে পারেনি। তারা উভয় পক্ষকেই শত্রু হিসেবে নিয়েছিল। এই অপারেশন ব্যর্থ হলেও ইসলামি আন্দোলনের কলাকৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল; তারা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

ইয়াহিয়া হাশিম আরেকজন ব্যক্তি, যার প্রভাব জাওয়াহিরির মাঝে পড়েছে। তারা ভালো বন্ধুও। হাশিমের বিষয়ে জাওয়াহিরি লিখেছেন—

> *মিশরের জিহাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি একজন অগ্রদূত। আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক গুণ দিয়েছেন। সাথে সুন্দর এবং দৃঢ় একটি হৃদয়ও দান করেছেন। তার যা কিছু ছিল সব তিনি উৎসর্গ করেছেন। পৃথিবীর এমন বিষয়গুলোকেও তিনি গুরুত্ব দেননি, যেগুলো নিয়ে অন্যরা প্রতিযোগিতা করে। জেলা আইনজীবীদের মাঝে ইয়াহিয়া হাশিমের অবস্থান ছিল অনেক উপরে। এরকম একটি পদ যুবকরা কামনা করে থাকে। কিন্তু এমন পদে অবস্থান করেও তিনি অহংকারী হননি। আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে কুরবানি করার জন্য সবসময় প্রস্তুত ছিলেন।*

হাশিমের সাথে জাওয়াহিরির দেখা হয় ১৯৬৭ সালের ব্যর্থতার সময়। হাশিম জাওয়াহিরির দলে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু চলে আসেন। এর কারণ, মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে তার দীর্ঘ এবং শক্তিশালী সম্পর্ক। পরবর্তীতে হাশিম সশস্ত্র জিহাদি সংগ্রামের দিকে ধাবিত হন আর সালেহ সিরিয়ার দলের সাথে সম্পর্ক গড়েন। অবশেষে হাশিম মেনিয়া পর্বতে

---

৪৯. আপার ইজিপ্টের একটি শহর।

আত্মগোপন করে তার সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু মিশরীয় সরকার তাদের ক্যাম্পে হামলা চালায়। তাদের সাথে যুদ্ধ করা অবস্থায় হাশিম শহিদ হন।

এসাম আল-ক্বামারি জাওয়াহিরির সমসাময়িক লোক এবং তার সাথে জাওয়াহিরির অনেক মিল ছিল। দুজনেই হাইস্কুলে থাকা অবস্থায় ইসলামের সঠিক অর্থ খুঁজে পায়। তাদের মধ্যে মিল ছিল যে দুজনই নিজেদের মধ্যে মৌলবাদ লালন করত এবং উভয়ের মধ্যে সেটা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তারা মনে করত, উম্মাহর ভালোর জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা জরুরি। জাওয়াহিরি ক্বামারির প্রতি তার ভালোবাসা কখনও গোপন করেনি। ক্বামারি মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করত, অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই পরিবর্তন আনা সম্ভব। জাওয়াহিরি এবং ক্বামারি এই বিষয়ে একমত ছিল যে, সেক্যুলার সরকারকে সরিয়ে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যুত্থান সবচেয়ে ভালো উপায়। তারা এটাও মনে করত, জিহাদি আন্দোলনের মাধ্যমে কম সময়ে এবং কম রক্তপাতের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসা সম্ভব। কারাগারে থাকা অবস্থায় আমি খেয়াল করেছিলাম, ক্বামারি একজন শক্তিশালী লোক। তিনি জিহাদি আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন, এমনকি জাওয়াহিরিকেও। আমি দেখেছি, তোরা কারাগারে, জামাআ আল-ইসলামিয়ার সদস্য এবং অন্যান্য ছোট ছোট জিহাদি দলের সদস্যদের ওপর দিয়ে কেমন ঝড় বয়ে গেছে। শায়েখ ওমার আব্দেল রহমান তার অন্ধত্ব[৫০] সত্বেও তাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্বামারি উচ্চস্বরে আবদেল রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। ফলস্বরূপ, কারাগের নেতৃত্বে থাকা জামাআ আল-ইসলামিয়া এবং অন্য জিহাদি দলগুলোর মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। ক্বামারি ছিলেন একজন নির্ভীক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর পথে চলার সংগ্রামে কাউকে ভয় করেননি। কিন্তু তিনি একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিলেন। তার এই একগুঁয়েমীর

---

৫০. ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার জন্য একজন মুসলিম নেতার দেখার সক্ষমতা থাকতে হবে।

জন্য জেলখানায় সহকর্মীদের সাথে তার সমস্যা হয়েছিল। বিশেষ করে, নবসংগঠিত ইসলামিক দলগুলোতে আবদেল রহমানের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এসাম আল-ক্বামারিকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। তার সাথে যখনই আমার দেখা হতো, তিনি আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতেন। আমিও তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতাম। যার কারণে সেসময় অনেকেই আমার ওপর বিরূপ হন।

এখনও তিনি জাওয়াহিরিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য করেছেন প্রেস এবং কোর্টের প্রথম সেশনে।

তার প্রতিনিধি হয়েই জাওয়াহিরি citadel prison এ অমানবিক নির্যাতনের শিকার বন্দীদের কথা বলেছিলেন। বিশেষ করে আমার কথা। সেই অসিলায় সরকার কর্তৃপক্ষ আমাকে আর আমার ইসলামিস্ট সহকর্মীদের সাধারণ জেলে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়।

সাইয়েদ ইমাম আব্দেল আযীযও জাওয়াহিরির জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও অনেকে তার প্রভাব দেখতে পান না। তারা শুধু এতটুকু জানেন যে, ১৯৮১ সালের ঘটনার আগে জাওয়াহিরি আব্দেল আযীযকে পুরাতন গ্রুপে যেতে বলেছিল। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, আবদেল আযীয জাওয়াহিরির চিন্তাধারায় অনেক প্রভাব রেখেছেন। সেই ১৯৬০ এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের সুসম্পর্ক এ কথাই বলে। জাওয়াহিরি নিজের ওপর আবদেল আযীযকে প্রাধান্য দিতেন বলে পেশোয়ারে তিনি যেই জিহাদি দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আবদেল আযীযের হাতে তার নেতৃত্ব তুলে দেন। জাওয়াহিরির সাথে একটি ফিকহী (ইসলামি আইনশাস্ত্র) বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য হওয়ার আগ পর্যন্ত ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আবদেল আযীয ইসলামি জিহাদ গ্রুপের হাল ধরেছিলেন। তারপর জাওয়াহিরি নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। তারপরও আবদেল আযীয সেই দলের শরিয়াহ কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে ছিলেন। এর গঠন সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখেছেন *আল-ওমদা ফি ইদাদ আল-অদ্দা* [The

Basis for Preparedness] নামে। বইটিতে সেই দলের চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনে করণীয় এসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—সেখানে আছে, সংসদে যাওয়া এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী হারাম।

অনেকে মনে করেন, *The Basis for Preparedness* বইটি জাওয়াহিরির লেখা। এটি সত্য নয়।, কারণ জাওয়াহিরি *আল-জামঈ ফি তাবিল আল-ইলম আল-শারীয়াহ [The comprehensive Guide to seeking noble Knowledge]* নামে একটি বই লিখেছেন, যেটাতে সেই গ্রুপের চিন্তাধারা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য রয়েছে। এই বইটিই তাদের মতবিরোধের কারণ হয় এবং শেষ পর্যন্ত আবদেল আযীযের দল ছাড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ওসামা বিন লাদেনও জাওয়াহিরির ওপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে। যদিও প্রচলিত জ্ঞান অন্য কথা বলে। একদিক দিয়ে দুটোই ঠিক। পরের অধ্যায়ে জাওয়াহিরির ওপর ওসামা বিন লাদেনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাদাত হত্যার ফলাফল

আনোয়ার আল-সাদাতের হত্যাকে কেন্দ্র করে তিন দফা বিচারের পর আমরা যারা অভিযুক্ত হয়েছিলাম, তাদের মিশরের বিভিন্ন জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা সেখানে দুবছরের বেশি সময় কাটিয়েছি। আমি থাকতাম আবু জাবাল কারাগারে। তবে মাঝেমাঝে তোরা কারাগারেও নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানেই আয়মান আল-জাওয়াহিরির সাথে আমার দেখা হয়। ড. ওমার আব্দেল রাহমান নতুন তৈরি হওয়া বিভিন্ন জিহাদি দল এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃত্ব দেবেন কিনা এ নিয়ে বিতর্কও দেখেছিলাম সেখানে। শহরের জেলে বন্দী জিহাদিদের জন্য এটি সবচেয়ে জঘন্য একটি সঙ্কট ছিল।

এই সঙ্কট বিস্তৃতি লাভ করে পরাজিত মনোভাবের কারণে। নতুন তৈরি হওয়া দলগুলোর হতাশাজনক বিভিন্ন অপরিকল্পিত আক্রমণ সেটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৮১ সালে সাদাত যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং ইসলামি আন্দোলনের প্রায় ১,৫৩৬ জন কর্মীদের আটক করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন থেকে এই অপারেশনের শুরু। যা চলতে থাকে ৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে নাসর সিটিতে[৫১] মিলিটারি প্যারেড চলাকালে সাদাতকে খুন করা পর্যন্ত। কারাগারে চলা আবেগপূর্ণ উত্তেজিত আলোচনাগুলো এই ব্যর্থতার কারণ। কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো যে তারা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ অক্টোরব ১৯৮১ সালে আসসায়ুত সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রান ব্রিডিংয়ের হামলায় প্রায় ১০০ লোক মারা যায়। সেদিন ছিল পবিত্র ঈদুল আজহা (কুরবানির ঈদ)। এত বেশি মৃত্যের সংখ্যা দেখে মিশরীয় সরকার বুঝতে পারল যে কেবল ছোট ছোট দলগুলোই আতঙ্কের কারণ নয়, তাদের শত শত সমর্থকও রয়েছে।

---

৫১. কায়রোর নতুন শহরতলী, সৈনদের জন্য সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল। অক্টোবর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আয়োজিত উৎসব সেখানেই হয়েছিল।

জিহাদি আন্দোলনের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন জোটের নেতা হিসেবে শায়েখ আবদেল রহমানের মনোনয়নের বিরুদ্ধে বলছিলেন। কারণ, আবদেল রহমানের দুর্বল দৃষ্টিশক্তি। আবদেল রহমানের বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এসাম আল-ক্বামারি। সাথে জাওয়াহিরিসহ আরও অনেকেই ছিলেন। এটি একটি দারুণ বিষয় যে, গভীর মতপার্থক্য থাকার পরও জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতা রেফাঈ তাহা ও জাওয়াহিরির মাঝে ভালো সম্পর্ক ছিল। খুব সঙ্কটময় সময়ে রেফাই তাহা জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন, তখন তিনি মুক্তি পান এবং আফগানিস্তানে যান। নভেম্বর ১৯৯২[৫২] সালে ল্যাক্সার হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। আমার মনে হয়, তাদের সম্পর্কের সর্বোচ্চ অবনতি হয় ১৯৮৩ সালে কারাগারে থাকা অবস্থায়। তাহার সেই কথাগুলো আমার এখনো মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, এসাম আল-ক্বামারিকে আবদেল রহমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে জাওয়াহিরি অশান্তি বাড়াচ্ছে। তোরা কারাগারের হাসপাতালের একটি সেলে আমি যখন জাওয়াহিরিকে দেখতে গেলাম, আমার কথা শুনে সে শান্তভাবে উত্তর দিলো। বলল, তাহার কথার কোনো ভিত্তি নেই। সে আবদেল রহমানকে অনেক শ্রদ্ধা করে। আবদেল রহমানের সামাজিক এবং একাডেমিক মর্যাদার কথা উল্লেখ করে সে এ-ও মেনে নিল যে আবদেল রহমান অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারপরও জাওয়াহিরি এই কথার উল্লেখ করল যে, গ্রুপের এমন বিভক্তির সময়ে নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়াই আবদেল রহমানের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেমনটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে হাসান ইবনে আলি রা. করেছিলেন। রক্তপাত ঠেকাতে মুয়াবিয়ার হাতে খিলাফত তুলে

---

৫২. লাক্সরের Temple of Queen Hatshepsut-এ, জামাআ আল-ইসলামিয়ার সদস্যরা ৪ জন মিশরীয়সহ বিভিন্ন জাতীয়তার ৫৮ জন পর্যটককে মেরে ফেলে। এই ঘটনার পর দলের নেতারা ঘোষণা করে, তাদের বন্দী নেতা শাইখ আব্দেল রাহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমেরিকাকে চাপ দিতে তারা এটি ঘটিয়েছে।

দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত আবদেল রহমান জোর করে নেতৃত্ব ধরে রেখেছিলেন, যা অন্য জিদাহি দল এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার ভাঙনের কারণ হয়।

কারাগারে বন্দীদের ওপর নির্যাতনের কথা জানাজানি হয়ে গেলে বিচারপতি আবদেল গাফফার মোহাম্মদ আহমেদ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। জিহাদ কেসের সময় জাওয়াহিরি কারাগারে নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করার প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। যখন পাবলিক প্রসিকিউশন অফিস এই কেস পরিচালনার দায়িত্ব নিল তখন সে সন্তুষ্টচিত্তে অন্য অত্যাচারিত সদস্যদের পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজি হয়ে গেল।

জিহাদ কেস থেকে জাওয়াহিরি মুক্তি পেলে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে সে সৌদি আরবের জেদ্দায় চলে যায়। সেখানে হাসপাতালে কাজ করার পরিকল্পনা করেছিল। মাত্র একটি সাক্ষাতেই আমি বুঝেছি কেন সে মিশর ছেড়ে সৌদি আরবে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। আমি তখন মাজদি সালেমের সাথে ওমরা করতে সৌদি আরবে গিয়েছিলাম। মাজদি সালেম ইসলামি জিহাদি আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন। *তালে আল-ফাতেহ* কেসের জন্য বর্তমানে তিনি ২০ বছরের সাজা খাটছেন।[৫৩] ইবনে আল-নাফিস হাসপাতালে জাওয়াহিরির সাথে দেখা হয়েছিল আমার। সে তখন জেদ্দায় কাজ করত। তাকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। কারাগারে সৃষ্টি হওয়া আঘাতের ব্যথা হয়তো তার শরীরে ছিল না, কিন্তু অন্তরের বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছিল সে। সাদাত হত্যায় নগণ্য অবদান থাকার জন্য তাকে কারাগারে অত্যাচার করা হয়নি।

---

৫৩. Vanguards of Conquest হলো ইসলামি জিহাদ থেকে বেরিয়ে আসা ছোট একটি দল। জাওয়াহিরির সাথে মতভেদ হওয়ায় ইসলামি জিহাদ থেকে বেরিয়ে এসে আহমেদ হুসাইন ওগায়জা এই দলটি গঠন করে। ১৯৯৫ সালে এই দলের প্রায় এক ডজন সদস্য আটক হয়। সেখান থেকে সরকার পক্ষ ৪২ জনের বিরুদ্ধে এই দলের সাথে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে চারটি কেস করে।

কর্তৃপক্ষ তাকে তার কর্মের জন্য নির্যাতন করেনি, করেছিল তার সংযোগের জন্য। তাকে গ্রেফতার করার পর তারা আবিষ্কার করে মিশরীয় সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অফিসারের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। এসাম আল-ক্বামারি তাদের একজন। ক্বামারি ১৯৮১ সালে সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসে আর সরকার তার ইসলামিস্টদের প্রতি ঝোঁক বুঝতে পারে। জাওয়াহিরির বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ ছিল—ক্যাপ্টেন আবদেল আযীয আল-জামাল এবং ফার্স্ট ল্যাফটেন্টের আওমি আবদেল মাজিদের সাথে তার সম্পর্ক। জিহাদ কেস চলার সময় আমি জামাল এবং আবদেল মাজিদকে দেখেছিলাম। ঐ একবারই দেখেছিলাম। জাওয়াহিরি কারাগারে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়। নির্যাতন করে তাকে ক্বামারিসহ আরও কয়েকজন সহযোগীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়। জাওয়াহিরিকে তোরা কারাগার থেকে উচ্চ মিলিটারি আদালতে জিহাদি আন্দোলনে যুক্ত থাকা সেনাবাহিনী সদস্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে সে স্বীকার করে যে ঐ সেনাসদস্যরা ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করছে। ১৫ অক্টোবর ১৯৮১ সালে গ্রেফতার হওয়ার পর জাওয়াহিরি সরকারকে ক্বামারির অবস্থান সম্পর্কে জানাতে বাধ্য হয়। ক্বামারি তখন একটি ছোট মসজিদে আত্মগোপন করতেন। সেখানে নামাজ পড়তেন আর দলের অন্য সদস্যদের সাথে দেখা করতেন। এটা জাওয়াহিরির জন্য কষ্টদায়ক একটি স্মৃতি এবং তার ভোগান্তির মূল কারণ ছিল। আর এটাই তার মিশর ছেড়ে সৌদি আরবে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ১৯৮৭ সালে আফগানিস্তানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সে সৌদি আরবেই ছিল।

এই তিন বছরে আফগানিস্তান যাওয়ার সময়টাতে জিহাদি গ্রুপগুলোতে তার প্রভাব আরও বিশেষ রূপ ধারণ করে। তিনি দলগুলোর দিশেহারা সদস্যদের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করছিলেন।

আববুদ আল-যোমর—যিনি ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তোরা কারাগারে ছিলেন—তিনি জিহাদি আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক ছিলেন। তিনি ছিলেন কারারুদ্ধ নেতা। তার বার্তা, নির্দেশনা ও ঘোষণা পাওয়ার জন্য

তার দলের নেতারা মুখিয়ে থাকত। যোমর যখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছিলেন, তখন কারাগারের বাইরে মাজদি সালেম তার প্রতিনিধি হিসেবে জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ফিলিস্তিন-জর্ডান বংশোদ্ভূত এসাম মাতিরও সালেহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেসময় এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি আন্দোলনে পরিণত হয় এবং অনেক অনেক যুবকদের নিজেদের দলে ঢুকাতে সমর্থ হয়।

কিন্তু যোমরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবয়িত হচ্ছিল না। তার বদলে তারা জাওয়াহিরির উৎসাহ আর আকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত হয়। সালেম ব্যবসায়িক কারবারে কাজ করতেন, ফলে তাকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হতো। তার নিয়মিত অনুপস্থিতির কারণে মিশরীয় জিহাদি কর্মীরা তার হাত থেকে ফসকে যায়। মাতির অংশগ্রহণ মাজদি সালেমের অনুপস্থিতি দূর করছিল, কিন্তু একসময় তিনি সরকারকর্তৃক গ্রেফতার হন আর তাকে জর্ডানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাতির চলে যাওয়া যোমহরের সমর্থকদের মাঝে বড় একটি শূন্যতা তৈরি করে।

জামআ আল-ইসলামিয়া

এদিকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য মোহাম্মদ শাওকি আল-ইসলামবলি ব্যবসায়িক লক্ষ্যে মেয়নার মালাওয়ায়ি থেকে কায়রোতে আসেন। আইন আল-শামস বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনি একটি বইয়ের দোকান দেন। জামাআ আল-ইসলামিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল সেটি। আবদেল হামিদ, আবদেল সালাম, হুসাইন আব্বাস এবং নাবিল আল-মাগরিবির মতো জামাআ আল-ইসলামিয়ার অনেক সদস্য আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকতেন। উল্লেখ্য, খালেদ আল-ইসলামবলি ইসলামিক জিহাদ দলের সদস্য হলেও তার ভাই মোহাম্মদ শাওকি আল-ইসলামবলি ছিলেন জামাআ আল-ইসলামিয়ার সদস্য। মোহাম্মদ শাওকি আল-ইসলামবলি তার বইয়ের দোকানে ধর্মীয় বই এবং ধর্মীয় লেকচারের টেপ বিক্রি করতেন। সেই দোকানের মাধ্যমে তিনি একই সাথে নিজের কার্যক্রম চালাতেন আবার শায়েখ ওমার আব্দেল রাহমানের প্রচারণাও চালাতেন। ১৯৮৪ সালে নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেলে শায়েখ ওমার আব্দেল রাহমান মসজিদে যে খুতবা-ওয়াজ বলেছিলেন, সেগুলোর রেকর্ড বিক্রি করা হতো দোকানটিতে। শায়েখ আবদেল রহমানের কুরআন তিলাওয়াতের রেকর্ডও পাওয়া যেত। আল-আজহারের প্রফেসর আবদেল রহমান কুরআন তিলাওয়াতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এভাবে সাব ইবনে সালেহ মসজিদের প্রথম তলায় অবস্থিত মোহাম্মদ আল-ইসলামবলির বুকশপ জামআ আল-ইসলামিয়ার কায়রোর সদস্যদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আল-ইসলামবলির অসাধারণ প্রতিভা আর তার পরিবারের সমর্থন এই গ্রুপটির জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ। ইসলামবলির মা এই কাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন। ছেলে খালিদকে হারানোর পর তিনি এই কাজে উদ্যমী ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে জামাআ আল-ইসলামিয়া লোয়ার ইজিপ্টে ঢুকতে শুরু করে, ১৯৮১ সালে সাদাত হত্যা পর্যন্ত যেখানে তাদের উপস্থিতি ছিল না।

বাহির থেকে দল পুনর্গঠনের চেষ্টা

কিছু কারণে, জাওয়াহিরির জন্য মিশর থেকে দূরে—আফগানিস্তানে অবস্থান করে জিহাদি আন্দোলনকে পুনর্গঠন করা জামাআ আল-ইসলামিয়ার চেয়ে সহজ ছিল। কারণ, অভ্যন্তরে জামআ আল-ইসলামিয়া অনেক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল। অনেক তরুণ সোভিয়েতের সাথে যুদ্ধ করতে এবং কাবুলকে কমিউনিস্টদের দখল থেকে মুক্ত করতে আফগানে পাড়ি জমাচ্ছিল। ওসামা বিন লাদেনের সাথে জাওয়াহিরির সুসম্পর্ক ছিল। ফলে আগত যুবকদের সে সমাদরে গ্রহণ ব [illegible] বিন লাদেনের প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পে নিয়ে যেত। সেখানে যুদ্ধের জন্য তাদের মিলিটারি ট্রেনিং এবং মানসিক-রাজনৈতিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা ছিল। এই পরিবেশ জাওয়াহিরিকে নবাগতদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এছাড়াও তার নতুন আন্দোলনে সদস্য জোগাতে সাহায্য করে। তার আশা ছিল, এই আন্দোলনের মাধ্যমে সে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে, যার জন্য সে সারাজীবন কাজ করে গেছে—মিশরীয় সরকারের উচ্ছেদ। ১৯৬৪ সালে প্রথম যেদিন সে একটি গোপন দলে যোগ দেয়, সেদিন থেকেই এটাই তার লক্ষ্য ছিল। এ কথা আমি জাওয়াহিরির নিন্দা করার জন্য বলছি না, তার বিষয়ে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়ার জন্য বলছি।

এ কারণে আফগানিস্তানে কাজ করে যাওয়ার পাশাপাশি জাওয়াহিরি কায়রোর সাথেও সম্পর্ক রাখত। রাজধানীতে থাকা তার সমর্থকরা যোমরের দল থেকে সদস্য পাচ্ছিল এবং তাদের আফগানিস্তানে যেতে সাহায্য করছিল। নাবিল নাঈম আবদেল ফাতাহ এবং সারাওয়াত সালাহ শেহাতা জাওয়াহিরির লেখা এবং চিন্তাধারা প্রচার করছিল। এটি জনপ্রিয়তা পায় এবং যোমরের দলের প্রায় সব সদস্যকে জাওয়াহিরির দলে আনতে সহায়তা করে।

জাওয়াহিরির হলুদ রঙের কভারওয়ালা বুকলেট কায়রোর যুবকদের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ে। বইগুলো গোপনে বিতরণ করা হতো। কিন্তু

আবদেল ফাতাহ আর শেহাতার কাজ এতটা সফল হয় এবং এতটা জনপ্রিয় হয় যে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে পড়ে যায়। এই দুই লোকের জিহাদি মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার ভয়াবহ ফলাফল সরকার আঁচ করতে পারে। তাই ১৯৯১ সালে আবদেল ফাতাহকে গ্রেফতার করা হয়। শেহাতা নকল পাসপোর্ট বানিয়ে আফগানিস্তানে চলে যাওয়ার মাধ্যমে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। এভাবে সে জাওয়াহিরির আন্দোলনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ লোকে পরিণত হয়।

জেদ্দায় জাওয়াহিরির সাথে যখন আমার দেখা হয়েছিল, তখনও সে তার দল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সেসময় সে আমাকে বলেছিল, জামাআ আল-ইসলামিয়ার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ এটার গোপনীয়তা। এটা এতই গোপনভাবে কাজ করত যে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এমন কোনো লেকচারও তারা প্রচার করতে পারেনি। এ কারণে মিশরে গোপনীয় দল কার্যকরী নয়। সে আরও বলে, সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক না থাকলে যেকোনো দল অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এটিই তার লেকচার, সাহিত্য এবং প্রবন্ধ তৈরি এবং চিন্তাধারা প্রচারের পেছনের কারণ।

জাওয়াহিরির ভিশন

জাওয়াহিরির মতবাদ বিশ্লেষণ করার আগে তার অসাধারণ কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করা দরকার। জাওয়াহিরি একজন ভালো প্রকৃতির লোক। কোমল এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ। সে খুব কম কথা বলে, যার কারণে সে আজীবনই ইন্ট্রোভার্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তার চিন্তাধারা সবসময়ই গোছালো ছিল। তাই সে যখন কথা বলে তখন সুন্দরভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। সে ঠান্ডা মাথার অধিকারী স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। কখনও রেগে যায় না। যার কারণে কঠিন সময়েও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। জাওয়াহিরির চিন্তাধারা বুঝতে হলে সম্ভ্রান্ত শিকড়ের বিস্তৃতি আরেকটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তার পরিবারের একটি বৈপ্লবিক ঐতিহ্য আছে। তার দাদা মোহাম্মদ আল-জাওয়াহিরি ছিলেন একজন বিখ্যাত আজহারি[৫৪] আলেম। রাজবংশের ভোগদখল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। জাওয়াহিরির নানা আবদেল রহমান পাশা আযযাম ছিলেন আরব লীগের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি মন থেকে আরব দেশগুলোকে একত্র করতে চেয়েছিলেন। জাওয়াহিরির মামা সালেম আযযাম ইউরোপীয় ইসলামিক কাউন্সিল, লন্ডন-এর পরিচালক। আরেক মামা মাহফুজ আযযাম বিরোধী দল মিশরীয় লেবার পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৮১ সালের জিজ্ঞাসাবাদে জাওয়াহিরি বলেন যে তার মামা সালেম তাকে অর্থসাহায্য দিচ্ছিলেন এবং ধারণা করা হয়, মাহফুজের মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্ক আছে। পরে জাওয়াহিরি সাক্ষ্য দেয় যে এই স্বীকারোক্তি সে অত্যাচারের ফলে ভুলবশত দিয়ে ফেলেছে। তার মামা সালেহ আযযাম তাকে কোনো অর্থ প্রদান করেননি। এই সাক্ষ্যের কারণে তার দুই মামা বেকসুর খালাস পান। অল্পকথায়, জাওয়াহিরির পরিবার একটি বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে এসেছে। অন্যায়ের

---

৫৪. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি পাওয়া ব্যক্তি।

প্রতিবাদ করার মানসিকতা তার মাঝে রোপিত হয়েছিল। এর থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, ১৯৬৭ সালের জুনে ইসরায়েলের কাছে পরাজিত হলে জাওয়াহিরি কেন নিজের জন্য অভিজাত জীবনযাপন ছেড়ে দেয়। 'অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে সশস্ত্র ইসলামিক গ্রুপগুলো গড়ে ওঠেছে' জাওয়াহিরির আর তার বন্ধু ওসামা বিন লাদেনের সম্ভ্রান্ত পরিবেশ এই দাবির বিরুদ্ধে কথা বলে। এটা ভিত্তিহীন দাবি। অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তিই উচ্চ সামাজিক শ্রেণি থেকে এসেছেন। যেমন—ব্যবসায়ী, পেশাজীবি। তাদের ইসলামি বিশ্বাসের কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

যখন কেউ কোনো চিন্তাধারা বিশ্বাস করে, বিশেষ করে সেটা যদি ইসলামের মতো মহান, প্রাচীন এবং সভ্য চিন্তাধারা হয় তাহলে সেটা সামাজিক এবং শ্রেণিগত পার্থক্য অতিক্রম করে যায়। দরিদ্রতা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দারিদ্র্য ইসলামি চিন্তাধারার দিকে যাওয়ার কারণ নয়। ধনী হোক কিংবা দুঃস্থ, যে কেউ-ই ইসলামের অনুসারী হতে পারে। অবহেলিতরা ইসলামের দিকে আসে সামাজিক সংহতি এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায়। উচ্চবিত্তরা ইসলামকে দেখে আল্লাহর নিকটবর্তী যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে। এর কারণে তারা চাহিদাসম্পন্নদের অর্থ দান করে।

আমি জাওয়াহিরির চিন্তার সাথে একমত হই বা না হই, আমি তাকে সম্মান করি। সে তার সামাজিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতি করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। সে তার বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার জন্য নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছে। এমনকি এত ত্যাগ স্বীকারের পরও সে বিনয়ী এবং নিরহংকার। এই কারণে তার অনুসারীরা তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

ওসামা বিন লাদেনের পরিবার তাকে ত্যাজ্য করেছে এবং প্রেসে ঘোষণা দিয়ে পৃথিবীকে জানান দিয়েছে যে তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কিন্তু জাওয়াহিরির পরিবার এমনটা করেনি। তারা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। এমনকি সবচেয়ে খারাপ সময়েও তাকে ত্যাজ্য

করেনি। তারা তার সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য এবং তার চিন্তাধারাকে সম্মান করার জন্য অনেক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। তারা এখনও তাকে নিজেদের একজন মনে করে। জাওয়াহিরির পরিবার তার এবং তার কাজকর্মের পেছনে অনেক কারণ দাঁড় করায়। তার পরিবারের কিছু সদস্য মিশর থেকে তার চলে যাওয়া, সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামা ও তার জীবনের অন্যান্য পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কারণ আছে বলে মনে করে। তার চলে যাওয়ার পেছনে তারা মিশরীয় সরকারের অত্যাচারকে কারণ হিসেবে দেখে। উপসংহারে আমি এসব বলছি, জাওয়াহিরি এবং তার বিশ্বাসকে অপছন্দ করে কিন্তু তার পরিবারের ওপর শ্রদ্ধা রেখে।

তাদের মতো না দেখে আমি জাওয়াহিরিকে দেখি একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে। মিশরে তার কাজকর্ম এবং প্রভাব জানান দেয় যে তার চিন্তা, কর্মপন্থা, কলাকৌশল আরেকটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রাখে। যে কেউ এ বিষয়ে সন্দিহান, ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওসামা বিন লাদেনের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশের ঘটনাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে নাইরোবির আমেরিকান অ্যাম্বাসি এবং দারুস সালামে বোমা হামলার[৫৫] ঘটনা, ইয়েমেনের আদেন পোর্টে[৫৬] আমেরিকান যুদ্ধ ক্যাম্পে বোমা হামলা এবং এসব ঘটনায় মিশরীয় মিলিটারি কোর্টের মামলা হয় যেটা সংবাদ মাধ্যমে আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেস নামে পরিচিত।

---

৫৫. ১৯৯৮ সালে নাইরোবির আমেরিকান দূতাবাসের বাইরে এ বোমা বিস্ফোরিত হয়। একই সময়ে দারুস সালামের আমেরিকান দূতাবাসেও বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই হামলার ফলে প্রায় ২০০ লোক মারা যায় এবং হাজারও লোক আহত হয়। আমেরিকা আল-কায়েদার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে এবং এই হামলার অভিযোগে চার ব্যক্তিকে আটক করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

৫৬. ২০০০ সালের অক্টোবর নৌকারোহী দুজন ব্যক্তি ইয়েমেনের আদেন বন্দরে থাকা আমেরিকার নৌবহরে বোমা ফেলে। এতে বেশ কজন আমেরিকান সৈন্য মারা যায় ও জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারপর পৃথিবী ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর রক্তাক্ত ঘটনা দেখতে পেয়েছিল। সেই বিস্ফোরণে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসির হাজারো মানুষ মারা যায়। এর জন্য আমেরিকা ওসামা বিন লাদেন এবং আয়মান আল-জাওয়াহিরি দুজনকেই দায়ি বলে ঘোষণা করে। আর এর ফলে তারা আমেরিকার এক নম্বর ও দু নম্বর মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিতে পরিণত হন।

এই ঘটনা প্রকাশ করে জাওয়াহিরি তার চিন্তাধারার শীর্ষে পৌঁছেছে। জাওয়াহিরির চিন্তাধারা নিয়ে আমি বিশ্লেষণ শুরু করছি তার নিজের স্বীকারোক্তি তুলে ধরে, যেটা সে ১৯৮১ সালের জিহাদ কেসে নিজেই লিখেছিল।

জাওয়াহিরির জবানবন্দী

কেস ৪৬২, ১৯৮১

হায়ার স্ট্রেট সিকিউরিটি কোর্ট (জিহাদ কেস)

১৯৮১ সালের ২ নভেম্বরে হায়ার স্ট্রেট সিকিউরিটি কোর্টের ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি মাহমুদ মাসউদের জিজ্ঞাসাবাদে জাওয়াহিরি এই বিবৃতি দেয়—

আমি বলতে চাই যে ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে আমি একটি ধর্মীয় দলের সদস্য ছিলাম। যার নেতা ছিলেন ইসমাঈল তানতাবী এবং সেখানে সাইয়িদ হানাফি নামে আরেক সদস্যও ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে উৎখাত করা। অলেইওয়া মোস্তফা আলইয়া এবং এসাম আল-ক্বামারি এবং অন্যরা পরে আমাদের সাথে যোগ দেয়। ১৯৭৪-৭৫ সালের দিকে দলটি সর্বোচ্চ বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালে আলেইওয়া দলের কর্মপন্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দল ছেড়ে চলে গেলে দলের মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়। বেশ কয়েকজন মতপার্থক্যকারী টেকনিক্যাল মিলিটারি দলে যোগ দেয়। তারপরও ইসমাইল তানতাবী, মোহাম্মদ আব্দেল রাহিম এবং আমি আমাদের দল চালিয়ে যাই। ১৯৭৫ সালের শেষে তানতাবী জার্মানি চলে যায়। তাই আমি দলের জন্য নতুন সদস্য খুঁজতে থাকি। মোহাম্মদ আব্দেল রাহিমও নতুন কিছু সদস্য এনেছিল। আমি দলে এনেছিলাম এমন কিছু সদস্যের নাম হলো—নাবিল আল-বোরাই, আমার ভাই মোহাম্মদ আল-জাওয়াহিরি, সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীয, মোহাম্মদ মোস্তফা শালাবি এবং এসাম হাশিশ। নাবিল আল-বোরাইয়ের মাধ্যমেও আমি বেশ কিছু সদস্য ঢুকিয়েছি। যেমন—ওয়াহিদ জামাল আল-দীন, খালেদ মেধাত আল-ফিক্বি, খালেদ আবদেল সামী, হাসান আলি এবং তার বন্ধু তারিক। তার শেষ নাম কী ছিল সেটা আমার মনে পড়ছে না। মাদি থেকেও নতুন কিছু সদস্য নেওয়া হয়েছিল। যেমন, ভ্যাটেনারি মেডিসিন বিভাগের ছাত্র এসাম, এয়ারফোর্সের টেকনিক্যাল স্টাফ সার্জেন্ট ইউসুফ আবদেল মাজীদ, ইউসুফ রিয়াদ নামে পরিচিত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞান

বিভাগের ছাত্র। মোহাম্মদ আব্দেল রাহীম তার দলে বেশ কিছু নতুন সদস্য নিয়েছিল। কিন্তু আমি কখনও তাদের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করিনি। আমি শুধু আবু আল-হাসান নামে একজনের কথা মনে করতে পারছি। সে আবদেল রাহীমের সাথে আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগে পড়ত। আর শুবরাতে থাকত। আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের আরো দুজন ছিল। আমার যতদূর মনে পারছে তাদের একজনের নাম মাহমুদ। তার পুরো নামটা আমি মনে করতে পারছি না। মোহাম্মদ আবদেল রাহিম আমাকে বলেছিল যে প্রায় এক মাস আগে সে বেশ কিছু যুবককে দলে নিয়েছে, সে তাদের দেখা শোনা করছে। শেষ দুই বছরের মধ্যে, আমি আমিন ইউসুফ আল-দোমেরিকে দলে ঢুকিয়েছি। আমার ভাই মোহাম্মদ যে এখন সৌদি আরবে থাকে সে দুজন মিশরীয়কে নিজেদের দলে ভেড়াতে সফল হয়েছে। তাদের নাম মোস্তফা কামাল মোস্তফা আর আবদেল হাদি আল-তুনসি।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য আমাদের দল থেকে চলে গিয়েছে। যেমন—ওয়াহিদ জামাল দীন, তারিক, হাসান আলি এবং ইউসুফ রিয়াদ। গ্রেফতার হওয়ার আগে আমি দলের প্রধান ছিলাম। আর সদস্য ছিল মোহাম্মদ আবদেল রাহিম, সাইয়িদ ইমাম আবদেল আযীয, আমিন আল-দোমেরি, নাবিল আল-বোরাই, খালেদ মেধাত আল-ফিক্বি, খালেদ আবদেল সামী আর আমার ভাই মোহাম্মদ সহ সৌদি আরবের তিনজন।

প্রায় এক-দুই মাস আগে আমার দলের সদস্য আমিন আল-দোমেরি আববুদ আল-যোমরের দলের একজন লোকের সাথে দেখা করে। সম্ভবত তার নাম তারিক আল-যোমর। এই সাক্ষাৎকারে আমাদের এবং তাদের দলের মাঝে সহযোগিতার চুক্তি হয়। এই সহযোগিতার একটি নমুনা হলো, আববুদ আল-যোমরের দলের কাছে একটি মেশিনগানসহ কিছু বিস্ফোরক ছিল। সেগুলো তারা আমিন আল-দোমেরির কাছে রাখতে দেয়। আবার, আববুদ আল-যোমর যখন পলাতক ছিল, তখন তার একটি সজ্জিত বাসারও প্রয়োজন ছিল। তখন আমিন আল-দোমেরি তাকে থাকার জন্য বাসার ব্যবস্থা করে দেয়।

দোমেরি আমাদের দলের অর্থনৈতিক পুঁজি থেকে যোমরকে ৮০০ ইউরোও দিয়েছে। এই অর্থটা আমি দোমেরিকে বক্তা কেনার জন্য দিয়েছিলাম। কারণ, আমাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল রাষ্ট্রপতির খুনের পর আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বক্তৃতা দেব এবং রেডিওতে বিবৃতি প্রদান করব।

যোমরও দোমেরিকে বিস্ফোরক দিয়েছিল ১২ অক্টোবর ১৯৮১ সালে, এগুলো দেখে রাখার জন্য।

যোমরের সাথে আমার সম্পর্ক শুরু হয় সাদাত হত্যার পর, ৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে। সেদিন রাত দশটায় হারামের[৫৭] একটি এপার্টমেন্টে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সেখানে সে লুকিয়ে থাকত। দোমেরি ও সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীয আর আমি একটি গাড়িতে করে সেখানে গিয়েছিলাম। আবদেল আযীয আর আমি গাড়িতেই বসে ছিলাম। দোমেরি এপার্টমেন্টের ভেতরে গিয়েছিল এবং আমাদের সাথে দেখা করার জন্য যোমরকে এনেছিল। যোমরের সাথে আমি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। প্রথমত, আমি তাকে বলেছিলাম, এই হত্যাকাণ্ডটিই যথেষ্ট। সরকার পক্ষের সাথে যুদ্ধ বাড়ানো তার জন্য উচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসাম আল-ক্বামারি নামের কোনো মেজর বা জামাল রাশিদ নামের কোনো অফিসারকে সে চেনে কি না যে সাদাত হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন করেছিল। আমি তার কাছে আরও জানতে চেয়েছিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সে সরাসরি জড়িত কি না।

সে উত্তর দিয়েছিল, এসাম ক্বামারিকে সে চেনে না, জামাল আল-রাশিদকেও সে জানে না। আর যে লোকগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা সবাই সরাসরি তার সাথে জড়িত।

---

৫৭. অর্থ পিরামিড, এটি বৃহত্তর কায়রোর অংশ। কিন্তু সরকারি হিসেবে গিযার অংশ ধরা হয়। এই এলাকায় স্বল্প আয়ের লোকজনের বসবাস। এখানকার চটকদার রুচিহীন হোটেলগুলো ব্যালে ড্যান্সিং ক্লাবের জন্য পরিচিত।

এরপরও যোমরের সাথে আমার তিন বার দেখা হয়েছে। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের এক-দুদিন পর আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়। আমি, এসাম আল-ক্বামারি আর দোমেরি—আমরা তিনজন গাড়িতে করে গিয়েছিলাম। যোমর যেই এপার্টমেন্টে থাকত, সেটার সামনে দোমেরির কারের ভেতর মিটিংটি হয়েছিল। ক্বামারি যোমরের কাছে জানতে চেয়েছিল, জামাল রাশিদ হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল কি না? যোমর জানিয়েছিল, সে জানে না। ক্বামারি আরও জানতে চাইল যে সে যেমনটা শুনেছে যোমর সাদাতের জানাযায় আসা লোকদের টার্গেট বানানোর পরিকল্পনা করেছে—এটা সত্য কি না? যোমর উত্তর দিলো, সে এই ব্যাপারে ভাবছে। তখন ক্বামারি তাকে বলল যে সে রিপাবলিকান গার্ডসদের[৫৮] ওপর একটি ব্যাটালিয়ন ট্র্যাক দিয়ে হামলা চালানোর কথা ভাবছে। কিন্তু যোহর তাকে বলল, মিলিটারি অ্যাকশন এখনও সুপরিকল্পিত নয়।

আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, ক্বামারির একটি ছদ্মনাম ছিল, জাকারিয়া। এই নামটাই যোমর জানত। যোমর যখন ক্বামারিকে দেখল তখন সে চিনতে পারল ক্বামারিই আর্মি থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই অফিসার, প্রশাসন ইসলামি আন্দোলনের সাথে যার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে।

তৃতীয়বার আমরা কিটক্যাট স্কয়ারে যোমরের সাথে দেখা করেছিলাম, তারপর তার সাথে তার এপার্টমেন্টেও গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল ১৯৮১ এর অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ। কিন্তু সেদিন আমরা ক্বামারির সাথে দেখা করার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। সেই প্রথমবার আমি যোমরের এপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। আমরা এপার্টমেন্টের একদম শেষ ঘরটায় বসেছিলাম। আমরা সেদিন আস্যাউত অপারেশন নিয়ে কথা বলছিলাম, যেটা সাদাত হত্যার দুই দিন পরে ঘটেছিল। সেই অপারেশনে তারা আস্যাউত সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ের

৫৮. রাষ্ট্রপতির সুরক্ষার জন্য থাকা নিরাপত্তা বাহিনী। দেশের সবচেয়ে প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বাহিনী।

ওপর আক্রমণ করেছিল। আমি তাকে বললাম, আস্যাউত অপারেশনে লাভের চেয়ে লোকসানের পরিমাণ বেশি।

আমরা যোমরের কথায় সম্মতি দিলাম যে আগামীকাল, মানে ১২ অক্টোবর আমরা ক্বামারিকে সাথে নিয়ে তার সাথে দেখা করতে আসব। যোমর আগের সাক্ষাতে ক্বামারিকে দশটি গ্রেনেড এবং দুটি পিস্তল আনতে বলেছিল, সেকথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তৃতীয় সাক্ষাতে এপার্টমেন্টে যোমরের সাথে আরও প্রায় তিনজন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন ঘুমোচ্ছিল। যোমর তাকে তারিক নামে ডাকছিল। যোমর তাদের সবাইকে সেই ঘরটা ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে চলে যেতে বলল। আমি সেই চার ব্যক্তির একজনকেও চিনি না। এ-ও জানি না, দোমেরির আর আমার আসার আগে যোমর ঐ লোকগুলোকে কী বলেছিল। কারণ, আমরা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে চলে যেতে বলা হয়েছিল।

যোমরের সাথে চতুর্থ এবং শেষ দেখা হয়েছিল যখন দোমেরি, ক্বামারি আর আমি হারামে সে যে জায়গায় লুকিয়ে ছিল সেখানে গিয়েছিলাম, ১২ অক্টোবর ১৯৮১ সালে। সেসময় ক্বামারি যোমরের জন্য হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে এসেছিল যেগুলো যোমর চেয়েছিল। আমি জানি না কতগুলো গ্রেনেড দিয়েছিল। ক্বামারি, দোমেরি, যোমর আর আমি সেই ঘরে এক ঘন্টা যাবত বসেছিলাম। এই মিটিংয়ে যোমর দোমেরি এবং ক্বামারিকে কিছু বিস্ফোরক দেয়, যেমন ডাইনামাইট ইত্যাদি। সে ক্বামারিকে caliber 7.65mm এবং caliber 9mm ক্ষমতাসম্পন্ন বুলেটের ছোট দুটি বাক্স দেয়। আমি জানি না সে কতগুলো বুলেট দিয়েছিল। যোমর ব্যাখ্যা করছিল কীভাবে সে হ্যান্ড গ্রেনেড বানায় আর কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করে। ক্বামারি যোমরকে বলল, সে বিস্ফোরকের টাইম ডেটোন্যাটর বানানোর পদ্ধতি জানতে পেরেছে।

সে বলল, সে একটি ইলেকট্রিক সার্কিট তৈরি করতে পারে যেটাতে ফ্যান বা আতশবাজির পাউডারে ডুবানো ভাঙা বাল্বের টাইমার ব্যবহার করা যায়।

কামারি বিষয়টা সামনাসামনি দেখানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভুলবশত ডেটোন্যাটরটা অনেক শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো। তাই যোমর তখন ব্যালকনির দিকে গেল এটা দেখতে যে বিষয়টা কেউ খেয়াল করেছে কি না। তারপর পাশের ঘর থেকে কেউ একজন জানতে এলো আসলে কী হয়েছে। যোমর তাকে বলল, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে তাকে যেন বলে যে একটা চেয়ার মেঝেতে পড়ে গেছে। একটু পর আমরা যোমরের জায়গা ছেড়ে চলে আসি আর কামারিকে তার থাকার জায়গায় পৌঁছে দিই। কামারি সেই বাসায় দুমাস থেকে ভাড়া থাকত। দোমেরিই তাকে সেটা ঠিক করে দিয়েছিল। সেটা ঘটেছিল তখন যখন আমি দোমেরির সাথে কামারির পরিচয় করে দিই। কিন্তু দোমেরিকে এটা বলিনি যে কামারি একজন পালাতক আর্মি অফিসার। কিন্তু দোমেরি সেটা নিজেই বুঝতে পেরেছিল যখন আমি যোমরের কাছে যাওয়ার জন্য কামারিকে সাথে নিয়ে দোমেরির ফার্মেসিতে গিয়েছিলাম। আমি দোমেরিকে বলেছিলাম একজন পলাতক অফিসার যোমরের সাথে দেখা করে তাকে জিজ্ঞেস করতে চায় সে জামাল রাশিদ নামে আরেকজন অফিসারকে চেনে কি না, সে হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল কি না।

আমি কামারির সাথে পরিচিত হয়েছি এই বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে, মোহাম্মদ আবদেল রাহিমের মাধ্যমে। সে আমাকে বলেছিল, সেনাবাহিনীতে কামারির একটি দল আছে যারা বর্তমান সরকারকে হটিয়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে আমাকে আরও বলেছিল যে কামারির দল আমাদের দলের কাছ থেকে সহযোগিতা চায়। আবদেল রাহিম কামারিকে আমার বাড়িতে এনেছিল। তারা দুটো ব্যাগ এনেছিল। আবদেল রাহিম আমাকে বলেছিল, সেই দুই ব্যাগভর্তি গোলাবারুদ আছে যেগুলো কামারি আর্মি থেকে এনেছে। কিন্তু সেগুলো লুকিয়ে রাখার জায়গায় পাচ্ছিল না সে। সে চায় আমি সেগুলো নিজের কাছে রাখি, কামারির দলকে করা সহযোগিতা হিসেবে। পরে আবদেল রহিম আমার কাছে এক সুটকেস ভর্তি মিলিটারি বই, মাইন, হ্যান্ড গ্রেনেড আর রিপাবলিকান গার্ডসের অবস্থানসমূহের ম্যাপ নিয়ে এসেছিল। আর

আমাকে বলল, এসাম ক্বামারি সেগুলো লুকতে চায়। তার মনে হচ্ছে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আমি সুটকেসের সব জিনিস রাখলাম, সুটকেসটা ছাড়া। দার আল-সালাম[৫৯] এলাকায় হাসান আলির নামে একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছিলাম আমরা, সেখানে এই জিনিসগুলো রাখলাম। তারপর সুটকেসটা হাসান আলিকে দিয়েছিলাম এপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রশাসন এই সুটকেসটা বাজেয়াপ্ত করে, যখন হাসান আলি রাস্তায় হাঁটার সময় ধরা পরার উপক্রম হয়। কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ক্বামারি আমাকে জানায় যে ইমবাবা[৬০] এলাকায় আরও কিছু বিস্ফোরক রাখা আছে যেগুলো সে লুকতে চায়। দোমেরি এবং আমি ফিয়াট ১২৪ গাড়িতে করে কিটক্যাট[৬১] এলাকায় ক্বামারির কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে ক্বামারিকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম। সেখানে নাবিল নাঈম নামের একজন তার সাথে ছিল। তার আরেকটি নাম আছে, আল-সাইয়িদ... এরকম কিছু। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম নাবিল এবং ক্বামারি গাড়ি চালিয়ে বিস্ফোরকগুলো এনে দোমেরি আর আমাকে দেবে। আমরা বললাম, আমরা কিটক্যাট স্কয়ারে অপেক্ষা করব। কারণ, ক্বামারি তার ইমবাবার এপার্টমেন্টে কাউকে সাথে নিয়ে যেত না। সে চাইত না কেউ এটার অবস্থান সম্পর্কে জানুক। প্রায় এক ঘন্টা পর তারা বিস্ফোরক নিয়ে এলো। দোমেরি আর আমি সেগুলো আমার মাদি এপার্টমেন্টে ১০ থেকে ১৫ দিনের জন্য রেখেছিলাম। সেসময় আমি হাসান আলিকে বলেছিলাম যে আমি বিস্ফোরকগুলো তার এপার্টমেন্টে সরাতে চাই। কিন্তু হাসান আলি বলল, তার এপার্টমেন্ট অনিরাপদ হয়ে পড়ছে এবং সে তার কাছে থাকা বিস্ফোরক গোলাবারুদগুলো অন্য কোথাও সরাতে চায়। সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীয আর আমি দার আল-সালাম এলাকায় গিয়েছিলাম নাবিল আল-বোরাইয়ের এপার্টমেন্ট থেকে বিস্ফোরক আর গোলাবারুদ আনতে।

---

৫৯. একটি স্বল্প আয়ের শহরতলী।
৬০. একটি স্বল্প আয়ের শহরতলী।
৬১. একটি স্বল্প আয়ের শহরতলী।

তারপর আমি আব্দেল আযীযের গাড়িতে করে আমার কাছে থাকা বিস্ফোরকগুলো নাবিলের এপার্টমেন্টে রেখে আসি। এসাম আল-ক্বামারির দলকে সাহায্য করার স্বরূপ হিসেবে আমরা সব বিস্ফোরক নিজেদের কাছে রেখেছিলাম। এসাম ক্বামারির লক্ষ্য ছিল এই বিস্ফোরকগুলোর মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করা।

আমাদের গ্রুপের একজন সদস্য খালেদ আবদেল সামী কিছু বুলেট আর হ্যান্ড গ্রেনেড এনেছিল আর্মিতে থাকা তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে। আমি তার সে আত্মীয়ের নাম জানি না। আমরা সেগুলো বোরাইয়ের এপার্টমেন্টে রেখেছিলাম। আববুদ আল-যোমর দোমেরিকে যেই বিস্ফোরক আর ডায়নামাইট দিয়েছিল সেটা তার ধরা পড়ার কিছুক্ষণ আগেই ঘটেছিল। দোমেরি সেগুলো আর দুটো পিস্তল ও দুটো গ্রেনেড আবদেল আযীযকে দিয়েছিল। আবদেল আযীয আর আমি সেগুলো আবদেল আযীযের বোনের নামে থাকা রোড ১০৬, মাদি এলাকার একটি এপার্টমেন্টে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমি পুলিশকে সেই এপার্টমেন্টের অবস্থান সম্পর্কে বলেছি।

আমি আরও যোগ করতে চাই যে, নাবিল আল-বোরাইয়ের মা আয়াতের বাহবিত গ্রামে সামান্য জমি কিনেছেন। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আমাদের সেখানে একটি এপার্টমেন্ট, একটি শস্যাগার ও একটি গুদাম তৈরি করা উচিত। আর চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ভেড়ার খামার বানানো উচিত। দরকারের সময় সেখানে আত্মগোপন করা যাবে, অস্ত্রও রাখা যাবে। আর তাই আমাদের একজনকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। সেই এপার্টমেন্ট এখনও নির্মাণাধীন আছে, আর আমরা সেটা এখনও ব্যবহার করিনি। দলের অর্থায়নে সেই বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছিল।

হারাম এলাকায় দোমেরির ফার্মেসীর কাছাকাছি আরেকটি এপার্টমেন্ট আছে। সে দলের অর্থ এটার পেছনে খরচ করেছে। এটাও এখনও নির্মাণাধীন আছে। আমরা এটা ব্যবহার করিনি।

আমিন আল-দোমেরি তার ফার্মেসির কাছাকাছি একটি গুদাম ভাড়া নিয়েছে। যোমরের কাছ থেকে পাওয়া কিছু অস্ত্র সে সেখানেই মজুত

রেখেছিল। গ্রেফতার হবার পর দোমেরি সেই গুদামের কথা পুলিশকে জানিয়েছে। পুলিশ রেইড দিয়ে অস্ত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে।

আমাদের দলের অর্থায়নের কথা বলতে গেলে এটা ছিল স্ব স্ব অর্থায়ন। অনুদান ও সদস্যদের চাঁদা অন্যতম মাধ্যম ছিল। সত্যি বলতে এই মাধ্যমগুলো যথেষ্ট ছিল না। যখন আমার ভাই ১৯৭৬ সালে সৌদি আরবে গেল, তখন সে তার বেতনের একটি অংশ আমাদের কাছে পাঠাতে লাগল। সৌদি আরবে থাকা তার দুই বন্ধুও একই কাজ করত। আমার ভাই লন্ডনে বসবাসরত সালেম আযযাম নামের এক বন্ধুকে আমাদের দলের জন্য, মিশরীয় সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য অর্থ দিতে বলে। সালেম আমার ভাইকে ১০০০ ডলার পাঠিয়েছিল, আমার ভাই সেগুলো আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি আমাদের দলের মতবাদ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে একটি মেমো বানিয়েছিল অভ্যন্তরীণভাবে দলের সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য। কিন্তু যখন আমি জানলাম যে বিভিন্ন ধর্মীয় দলের সদস্যদের আটক করা হচ্ছে, তখন আমি সেগুলো পুড়িয়ে ফেললাম। মোহাম্মদ আবদেল রাহিমের কাছে এই মেমোর একটি কপি ছিল। আমাদের দল রাষ্ট্রপতি হত্যার সাথে জড়িত ছিল না। পক্ষান্তরে আমরা এই খারাপ অবস্থা বৃদ্ধি প্রতিরোধে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যোমরের সাথে আলোচনা করেছি যাতে সরকারের সাথে সামনে কোনো সংঘাতে না জড়ায়।

যাহোক, ৬ অক্টোবর সকাল নয়টায় দোমেরি আমাকে এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জানায়। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এটি ভালো কাজ নয়।

তারপর জেরাকারীর সাথে জাওয়াহিরির নিচের কথাবার্তা হয়েছিল—

প্রশ্ন: কখন থেকে তুমি ধর্মীয় বিষয়গুলোর দিকে আগ্রহী হতে শুরু করো?

উত্তর: যখন আমি হাইস্কুলে ছিলাম, ১৯৬৫ অথবা ১৯৬৬ সালের দিকে। যখন আমি ধর্মীয় বইপত্র পড়া শুরু করি আর ১৯৬৫ সালে[৬২] মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘটনাগুলো দেখি। মুসলিম যুবকদের কেন ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার এ বিষয়ে কিছু লোক আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল। তারা বলেছিল, এসব ঘটনা একদম ইসলামের বিরুদ্ধে যায়। আমি তাদের কথায় আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

প্রশ্ন: তুমি যেই দলে ছিলে সেটা গঠন করার চিন্তা কখন মাথায় আসে?
উত্তর: আনুমানিক ১৯৬৬ কিংবা ১৯৬৭ সালে।

প্রশ্ন: দল গঠন করার চিন্তা কার মাথা থেকে এসেছিল?
উত্তর: মাদি হাইস্কুল এবং আরও কিছু স্কুলের ছাত্ররা মিলে শুরু করেছিল, যেমন ইসমাইল তানতাবী।

প্রশ্ন: দলটি কে প্রতিষ্ঠা করে?
উত্তর: আদিল আল-আয়াত নামের এক ছাত্র বুদ্ধি দিয়েছিল। তারপর ইসমাইল তানতাবী, সাইয়িদ হানাফি, আদিল আল-আয়াত এবং আমি এটি প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু খুব কম সময় পর আদিল আয়াতকে অপসারণ করা হয়।

প্রশ্ন: তোমরা কি দলটির কোনো নাম রেখেছিলে?
উত্তর: না।

প্রশ্ন: এই দলের প্রধান কে ছিল?
উত্তর: ইসমাইল তানতাবী দলের নেতা ছিল। নিয়মিত সদস্য হিসেবে সাইয়িদ হানাফি এবং আমি ছিলাম। তারপর অউলি মোস্তফা এলেইয়া

---

৬২. ১৯৬৫ সালে নাসের সরকার সাইয়িদ কুতুবকে ফাঁসি দেওয়ার মাধ্যমে ও মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদের গ্রেফতার করার মাধ্যমে দলটিকে চাপে ফেলে।

আমাদের সাথে যোগ দেয়। দলের বেশ কিছু সদস্য চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দলটি বিস্তার লাভ করছিল।

প্রশ্ন: এই দলের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর: আমরা একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম।

প্রশ্ন: তোমার দলের মতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা মানে কী?
উত্তর: এমন একটি সরকারব্যবস্থা, যে আল্লাহর নির্দেশিত শরিয়াহ মেনে শাসন করে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আবার জাওয়াহিরিকে ৫৬ পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করেন—
প্রশ্ন: তোমাদের দলের মতে জিহাদ কী?
উত্তর: জিহাদ মানে বর্তমান প্রশাসনকে সরিয়ে সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

প্রশ্ন: কীভাবে তোমরা বর্তমান সরকারের বদলে ইসলামিক সরকার আনতে?
উত্তর: একটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। আমরা মনে করতাম জনগণ এবং সেনাবাহিনী এই উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: কেন তোমরা বর্তমান সরকারকে সরাতে চাও?
উত্তর: কারণ, এরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার শরিয়াহ অনুসারে শাসন করে না।

এই সেশনের শেষে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মাহমুদ মাসউদ জাওয়াহিরিকে জিজ্ঞেস করেন, তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছ সেসব যথেষ্ট ছিল কি না? জাওয়াহিরি উত্তর দিয়েছিল, তারা চেষ্টা

করেছিল, তবে তাদের আরও এগুনো প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাদের অপর্যাপ্ত অর্থের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।

আরেকটি জিজ্ঞাসাবাদে ২ ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে মাহমুদ মাসউদ জাওয়াহিরির কাছে তাদের দল—যেটা ইসমাইল তানতাবী, সাইয়িদ হানাফি এবং আদিল আয়াত মিলে গঠন করেছিল—সম্পর্কে জানতে চায়। জাওয়াহিরি উত্তর দেয়—

শুরুতে, এই দলটি আমি, ইসমাইল তানতাবী, সাইয়িদ হানাফি, আদিল আল-আয়াত, আলি সাদ, মাদি এলাকার বাদর নামে একজন লোক, ইয়াহিয়া হাশিম এবং আবদেল আজিম আযযাম মিলে গঠন করেছিলাম। তারপর ইসমাইল তানতাবী, সাইয়িদ হানাফি এবং আমি সেই দল থেকে বেরিয়ে আসি, যেভাবে অন্য সবাই এসেছিল। তাই আমরা তিনজন নিজেদের একটি দল গঠন করলাম। অলওয়ী মোস্তফা আলাইওয়ী, মোহাম্মদ আব্দেল রহিম, এসাম আল-ক্বামারি সহ আরও অনেকে পরে সে দলে যোগ দিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে আলাইওয়ীর মতো কয়েকজন সদস্য দল ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে দলে প্রায় ৪০ জন সদস্য হয়। দল শুধু ইসমাইল তানতাবী, মোহাম্মদ আবদেল রহিম আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিছু সদস্য যেমন বের হয়ে যাচ্ছিল, তেমনই কিছু নতুন করে যোগদান করছিল। শেষ পর্যন্ত আমিসহ ১১ জন সদস্যে পৌঁছে। এদের মধ্যে ছিল আমিন আল-দোমেরি, সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীয, নাবিল আল-নোরাই, মোহাম্মদ আব্দেল রাহিম, খালেদ মেধাত আল-ফিক্বি, খালেদ আবদেল সামী, ইউসুফ আবদেল মাক্বিম সাথে সৌদি প্রবাসী তিনজন—আমার ভাই মোহাম্মদ, মোস্তফা কামাল মোস্তফা এবং আবদেল হাদি আল-তুনসি। এসাম নামের আরেকজন সদস্য ছিল। তার নামের শেষ অংশটা আমি মনে করতে পারছি না। কিন্তু মনে পড়ছে, সে ভ্যাটেনারি মেডিসিন বিভাগের ছাত্র ছিল।

প্রশ্ন: এই সদস্যরা কখন কীভাবে দলে যোগ দেয়?

উত্তর: আমিন আল-দোমেরি আমাদের দলে যোগ দিয়েছে দুই বছর আগে। সাইয়িদ ইমাম আমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি তাকে আমাদের দলে যোগ দিতে বললে সে রাজি হয়ে যায়। সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীয যোগ দিয়েছে ১৯৭৫ অথবা ১৯৭৬ সালে, যখন সে ক্বাসর আল-আইনি হাসপাতালে আমার সাথে প্র্যাক্টিসিং ডক্টর হিসেবে ট্রেনিং করছিল, আমাদের মেডিকেল শিক্ষার শেষ বছর। আমিই তাকে দলে ঢুকিয়েছি। নাবিল আল-বোরাই প্রথম দলটিতে ছিল। পরে ১৯৭৪ অথবা ১৯৭৫ সালে সে আমার দলে পুনরায় যোগ দেয়। আমিই তাকে আবার দলে নিই। মোহাম্মদ আব্দেল রাহিম দলের শুরু থেকে আমার সাথে ছিল। খালেদ মেধাত আল-ফিক্বি যোগ দিয়েছিল নাবিল আল-বোরাইয়ের মাধ্যমে, আরও তিন বছর আগে। খালেদ আবদেল সামী দলে যোগ দিয়েছিল ওয়াহিদ জামাল আল-দীনের মধ্যমে। কিন্তু পরে সে বের হয়ে যায়। ইউসুফ আবদেল মাজিদ যোগ দেয় নাবিল আল-বোরাইয়ের মাধ্যমে তিন বছর আগে। এসামও এক-দেড় বছর আগে নাবিল আল-বোরাইয়ের মাধ্যমেই যোগ দেয়। আমার ভাই মোহাম্মদ দলের শুরু থেকেই ছিল। মোহাম্মদ প্রায় তিন বছর আগে মোস্তফাকে এবং আবদেল হাদি আল-তুনসিকে প্রায় এক বছর আগে দলে নেয়।

প্রশ্ন: এই দল গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: আমরা চাপ প্রয়োগ করে বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে সরাতে চাই এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

৬২ নং পৃষ্ঠায় জাওয়াহিরির জিজ্ঞাসাবাদে সে অভ্যুত্থান সৃষ্টির পন্থাটা ব্যাখ্যা করেছে—

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম ধাপে সর্বোচ্চ সংখ্যক সাধারণ মানুষ ও সাথে মিলিটারি লোকজনকে নিজেদের দলে নেওয়া। কিন্তু অভ্যুত্থান যেহেতু একটি প্রায়োগিক বিষয়, যেটার জন্য একজন মিলিটারি লোক দরকার যে আমাদের দলে যোগ দেবে।

এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে জাওয়াহিরি প্রথম থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামকেই প্রয়োজন বলে মনে করত। সে মনে করত, একমাত্র এ উপায়েই ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সে আরও মনে করত, দাওয়াহ খুব একটা কার্যকর পদ্ধতি নয়। কারণ, একটি ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া মানুষের মনে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তার কাছে মানুষের পরিবর্তন এবং ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিচের প্রশ্নোত্তরগুলো জাওয়াহিরির চিন্তাধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়—

প্রশ্ন: বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার কী মনোভাব?

উত্তর: ইসলামি শরিয়াহর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন: বর্তমান শাসনব্যবস্থা আর ইসলামি শরিয়াহর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: অনেক পার্থক্য আছে। যেমন—বর্তমানে মদ, নাইটক্লাব আর জুয়া বৈধ। সরকার এসবের বিরুদ্ধে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করে না।

প্রশ্ন: ব্যর্থতা দূর করে কীভাবে ভালো পথ বা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে?

প্রশ্ন: সরকারকে ইসলামি শরিয়াহর আইনকানুন মেনে চলতে হবে এবং জনগণের শাসনকার্যেও ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

প্রশ্ন: শরিয়াহ অনুযায়ী কীভাবে সরকারের বদল ঘটবে এবং কীভাবে জনগণ পরিবর্তিত হবে?

উত্তর: ইসলামের মূলনীতিগুলো জনগণকে জানানোর মাধ্যমে।

জাওয়াহিরির চিন্তাধারা আমাদের আফগানিস্তানের তালিবান[৬৩] সরকারের শাসনব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের বেশিরভাগ জায়গা দখলের মাধ্যমে তারা তাদের দল প্রতিষ্ঠা করেছিল। তালিবানের দৃষ্টিভঙ্গি আর তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক মিল রয়েছে। তারা সেক্যুলার ও অনৈতিক এবং ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী অবৈধ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুমোদিত বিষয়গুলো হালাল বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে চায়। প্রতিস্থাপন করার মতো কিছু পাওয়া না গেলে তারা সরকারি আইন জারি করে সেগুলো বন্ধ করে দেয়। মেয়েদের মাথা না ঢাকা এবং ছেলেদের দাড়ি কাটাকেও তারা অবৈধ ঘোষণা করেছিল।

প্রয়াত আহমেদ আল-নাজ্জার বলেন, "ইসলামিক জিহাদ তালিবানের ক্ষমতা অর্জনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।"

নাজ্জার 'নাহিয়া' দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। জিহাদ কেসে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে তাকে খান আল-খালিল[৬৪] কেসে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০০০ সালে তিনি আলবেনিয়ায় ধরা পড়লে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইসলামিক জিহাদ তালিবানের সমালোচনাকে প্রতিহত করে, তালিবান সরকারের নারী শিক্ষা, স্কুল বন্ধ এবং মহিলাদের কাজে যাওয়া বন্ধ করার বিরুদ্ধে কথা বললেও নাজ্জারের কথা অনুযায়ী, ইসলামিক জিহাদ তালিবানে সমালোচনা এই বলে প্রতিহত করত, তালিবান স্কুলের সিলেবাস পরিবর্তন করেছে শুধু। তারা আরও দাবি করে, তালিবান মহিলাদের ততদিন পর্যন্ত কাজে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে যতদিন না

---

৬৩. তালিবান শব্দের অর্থ ছাত্ররা। পশতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রাব্বানীকে সরিয়ে ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। তারা কঠোর ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা ও ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পরিচিত।

৬৪. অভিযুক্তরা খাল আল-খলিলিতে কয়েকজন ইসরায়েলি পর্যটকের ওপর হামলার পরিকল্পনা করার জন্য গ্রেফতার হয়। খাল আল-খলিলি কায়রোর একটি বিখ্যাত মার্কেট। প্রাচ্যের জিনিসপত্র কেনার জন্য পর্যটকরা সেখানে ভীড় জমিয়ে থাকে।

তাদের জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ না পাওয়া যায়। আরও বলে, এটা শুধু সাময়িক সময়েও জন্য।

"এটা পরিষ্কার যে ইসলামিক জিহাদ তালিবানকে মনেপ্রাণে সমর্থন করে।" এই বলে শেষ করেন নাজ্জার।

জাওয়াহিরির সৈনিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টায় তার ইচ্ছাকে ভালোভাবে প্রকাশ করে, তার গোপন দলে যোগ দেওয়া থেকে নিয়ে সরকারকে উৎখাত করে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। জাওয়াহিরির যখন প্রস্তুতি ছিল না, তখন সে ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। সে সরকারের সাথে ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। কারণ, এতে তার দলের ক্ষতি হতে পারত।

তার যুক্তি অনুসারে, সে সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের সাথে আর কোনো সংঘাতের পরিকল্পনা করা থেকে আববুদ আল-যোমরকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে। সে আমিন আল-দোমেরি আর সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীযকে নিয়ে যোমরের সাথে দেখা করেছে, ৬ অক্টোবর ১৯৮১ সালে। যেখানে যোমর আত্মগোপন করে থাকত।

জাওয়াহিরি বলেছিল, "আমি যোমরকে বলেছিলাম, রিপাবলিক প্রেসিডেন্ট সাদাত হত্যার পর সরকারের সাথে আর কোনো সংঘাতে যাওয়া তার জন্য ঠিক হবে না।"

জিজ্ঞাসাবাদের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় জাওয়াহিরি তার দল এবং অন্য দলের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেন—

"আমরা বেশিরভাগ মুসলিম এবং চার ইমামের[৬৫] সাথে ঐকমত্য পোষণ করি। আমরা তাকফির ওয়াল হিজরাহ[৬৬] গ্রুপের মতো নই।

---

৬৫. চার ইমাম হচ্ছেন চারজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, যারা ইসলামি ফিকহের বা আইন-কানুনের বড় চারটি দলের প্রবর্তক। জাওয়াহিরি এখানে বুঝিয়েছে, দলটি ঐতিহ্যবাহী সুন্নি মতবাদের অনুসারী, কট্টরপন্থী মতবাদের অনুসারী নয়।

৬৬. আক্ষরিক অর্থে কাউকে কাফির ঘোষণা করা বা ইসলাম থেকে বিচ্যুত বলা। তাকফির ওয়াল হিজরা দলটি জিহাদি দলগুলোর মাঝে সবচেয়ে কট্টরপন্থী। এই দলের সদস্যরা সাধারণ মুসলিম জনগণ ও সরকারের সেসব লোকদের টার্গেট বানায় যারা তাদের মতে ধার্মিক নয়।

আমরা মানুষের গুনাহের কারণে তাদের কাফির মনে করি না। আর আমরা মুসলিম ব্রাদারহুডের থেকেও আলাদা কারণ তারা অনেক সময়ই সরকারের বিরোধিতা করে না।"

অনেকে হয়তো তার স্বীকারোক্তিতে দেওয়া তথ্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছিল। কারণ, তারা অস্বাভাবিক বিষয় থেকে নির্যাস বের করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কারাগার থেকে বের হয়ে ১৬ বছর পর তিনি যে কথা বলেছিলেন, তা সব সন্দেহকে উড়িয়ে দেয়। ফ্রান্সের নিউজ এজেন্সি Agence France Press (AFP)তে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার দল এবং মিশরীয় প্রশাসনের মাঝে সংঘাত বন্ধ করতে তিনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি না। জাওয়াহিরি বলেছিলেন—

"মুজাহিদদের, যারা কিনা ইসলামি জাগরণের আগ্রদূত, তাদের সাথে মিলিটারি সংঘর্ষ বা অন্য কোনো বিরোধ—সেটা চিন্তাগত বা মাধ্যমগত হোক না কেন—সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, যখন মুসলিমরা শাসকদের হাতে থাকবে।"

আফগানিস্তান: জিহাদের ভূমি

জাওয়াহিরির মামা, বিখ্যাত আইনজীবী মাহফুজ আযযাম আমাকে একবার বলেছিলেন, "আপনি সবসময় দাবি করে আসছেন, জাওয়াহিরি যে পন্থা অবলম্বন করতে চায় সেটি একটি হিংস্র পন্থা। আকস্মিক অভ্যুত্থান ও রক্তপাত এটার উদ্দেশ্য। আমি আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। জাওয়াহিরির পন্থা সম্পর্কে আমি দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে চাই না। এটা ব্যাখ্যাও করতে চাই না যে তার পন্থা হচ্ছে হিংস্র, আকস্মিক আঘাত হানা।"

আযযাম আইন বিষয়ে দক্ষ একজন ব্যক্তি। সেই সাথে আযযাম পরিবারের, জাওয়াহিরির মায়ের পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন। সে কারণে তিনি মনে করেন, ১৯৮৪ সালে কোর্ট জাওয়াহিরিকে বিনা অভিযোগে মুক্তি দেয়, এটাই আমার তত্ত্বকে ভুল প্রমাণে যথেষ্ট।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল প্রমাণ করে, তিনি সেই দলের দলপতি ছিলেন—এটা কোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই ভিত্তিতে, কোর্ট সম্পূর্ণ আস্বস্ত হয়েছিল যে জাওয়াহিরির বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা, শুধু একটি অবৈধ পিস্তল নিজের অধীনে রাখার অভিযোগ ছাড়া। আর এই অভিযোগের কারণে তার তিন বছরের জেল হয়।

জাওয়াহিরির মতবাদ অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক নয়, আযযামের এমনটি ভাবার আরেকটি কারণ, কেস ৫৬২, ১৯৮১ সালের কাগজপত্রের মূল বিষয়। এই কাগজপত্র অনুসারে, সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর জাওয়াহিরি দ্রুত আববুদ আল-যোমরের সাথে দেখা করতে যান হারাম এলাকায়, যেখানে যোমর লুকিয়ে থাকত। সেখানে তিনি যোমরকে বলেন, "আসসাউত সিকিউরিটি এডমিনিস্ট্রেশনের লোকদের হত্যা করার জন্য তোমার কাছে কোনো কারণ নেই। আমি এ বিষয়ে তোমার সাথে একমত নই।" জাওয়াহিরির চিন্তাধারা নিয়ে আমার আর আযযামের

মূল্যায়নের পার্থক্য হলো, আমারটা তার জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহাসিক হিসেব। অন্যদিকে আযযাম তার সম্পর্কের কারণে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনি জিহাদ কেসে জাওয়াহিরির আইনজীবী ছিলেন। তার নিজের ভাগ্নের চিন্তাধারা নিয়ে মূল্যায়ন মেনে নিলে জাওয়াহিরিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হবে। জাওয়াহিরির মিশর ছেড়ে চলে যাওয়া এবং ফিরে না আসার কারণ নিয়েও আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আযযাম মনে করেন, সাদাত হত্যা পরবর্তী ঘটনা তাকে ফিরে আসতে বাঁধা দিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮১ সালের অক্টোবরে আটক হওয়ার পর কারাগারে ভোগ করা নির্যাতনের কারণে তিনি মিশরে আসতে চাননি। আযযাম উল্লেখ করেন, জাওয়াহিরি মাদিতে তার ক্লিনিকটি টিকে রেখেছিল এবং এটার উন্নতির পেছনে অর্থ খরচ করছিল এই আশায় যে, অবশেষে সে একদিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

আমি আযযাম এবং জাওয়াহিরি পরিবারের কাছে বিনীতভাবে বলছি, কিছু বিষয়ে তাদের সাথে আমার মতপার্থক্য আছে।

জাওয়াহিরি যে উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেছিল, জিহাদ কেসে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তার মতো অন্য নেতাকর্মীরাও মিশর ছেড়ে চলে যান। আফগানিস্তান তাদের স্থায়ী হওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা ছিল। কারণ, এটা তাদেরকে সেই জিনিসটাই দিতে চাচ্ছিল যেটা তারা চাচ্ছিল—জিহাদ।[৬৭]

জাওয়াহিরির মিশরে থাকাটা ঠিক হতো না। কারণ, প্রশাসন তার কাজকর্ম সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। আর সে মূলত আর গোপনীয়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তার পন্থার অন্যতম উপাদান ছিল আর্মি এবং সাধারণ জনগণের মধ্য হতে বেছে বেছে কর্মী সংগ্রহ করা। এর কারণ, সে বিশ্বাস করত যে একটি সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমেই সবচেয়ে কম রক্তপাতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তার পরিকল্পনা প্রশাসন আবিষ্কার করে

---

৬৭. সেসময় আফগান বাহিনী তাদের দেশে সোভিয়েত দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। অন্যান্য দেশের মুসলিমরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তারা সেটাকে সেকুলারাইজেশন ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে দেখত।

ফেললে তারা তাকে নজরে রাখা শুরু করে। এটি তার গোপন পন্থা— এটিই তার পছন্দনীয়। কিন্তু তার এই পন্থার কথা জানাজানি হয়ে যায়। একটি ঘটনা তার ইচ্ছা সম্পর্কে জানান দেয়। যখন সে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রশাসন তাকে দেশের বাইরে কাজ বা চাকরি করার অনুমোদন দেয়নি, যেটা তার দেশ ছাড়ার জন্য দরকার ছিল। চতুর এবং বিচক্ষণ জাওয়াহিরি একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে তার পাসপোর্ট দেখিয়ে পর্যটক হিসেবে তিউনিসিয়ার একটি ট্রাভেল ভিসা পায় এবং মিশর ছেড়ে চলে যায়। তিউনিসিয়া নেমে সে জেদ্দার উদ্দেশ্য ভ্রমণ করে, সেখানে ইবনে আল-নাফিস হাসপাতালে সে কয়েকমাস চাকরি করে। সেখান থেকে সে পাকিস্তান যাওয়ার সুযোগ পায় এবং তারপর ঢুকে পড়ে জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানে।

জাওয়াহিরির মিশরে প্রত্যাবর্তন না করার আরেকটি কারণ হলো— জেলের অত্যাচারের মুখে বাধ্য হয়ে বন্ধু সতীর্থ এবং শিষ্যদের বিরুদ্ধে দেওয়া স্বীকারোক্তি। এমনকি সে পুলিশকে তার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসাম আল-ক্কামারির অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল। জাওয়াহিরির হয়তো মনে হয়েছিল এই কারণে সে তার শিষ্যদের কাছে নিজের নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সে তার শেষ বইয়ে তার স্বীকারোক্তি এবং ক্কামারিকে ধরতে পুলিশকে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেনি। যদিও ক্কামারি এবং তার আটক হওয়া নিয়ে কথা বলেছে, কিন্তু সেই কথাটি পাশ কাটিয়ে গেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, হায়ার স্টেট সিকিউরিটি কোর্টের কেস ৪৬২, ১৯৮১ সালের জিজ্ঞাসাবাদে জাওয়াহিরির দেওয়া স্বীকারোক্তিতে ক্কামারির গ্রেফতার সম্পর্কিত কথা ছিল। স্বীকারোক্তির ৩ নং পৃষ্ঠায় সে বলে—

আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম পরশুদিন, শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে। তখন আমি মাদির নাহদা স্ট্রিটে হাঁটছিলাম। স্টেট সিকিউরিটি পুলিশ আমাকে এসাম আল-ক্কামারির অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। কারণ, সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেহেতু আমি জানতাম, ক্কামারি মানশিত নাসের, জামালিয়া এলাকার একটি চামড়া কারখানায়

লুকিয়ে আছে, আমি পুলিশকে তা বলে দিলাম। তারা আমাকে সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিতে বলল আর আমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল। তাই আমি জানি না সেখানে আসলে কী হয়েছিল। সেদিন সকালে ক্বামারি আমার বাড়িতে ফোন করে আমাকে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তার সাথে দেখা করতে বলেছিল, কিটক্যাট স্কয়ারের ছোট্ট একটি মসজিদে, যেখানে আমরা দেখা করতাম।

পুলিশ আমাকে সেই মসজিদে তার সাথে দেখা করতে বলল, যাতে তারা তাকে ধরতে পারে। তারা চিন্তিত ছিল যে, তা নাহলে সেখানে প্রাণহানি ঘটতে পারে। আমি তাদের সাথে মসজিদে গেলাম এবং ক্বামারি না আসা পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে বসে থাকলাম। ক্বামারি মসজিদে এসে যখন মসজিদে প্রবেশ করার পর নফল নামাজ পড়ছিল তখন পুলিশ তাকে আটক করে।

২৮ নং পৃষ্ঠায় জাওয়াহিরি তার দলের সদস্য নাবিল আল-বোরাইয়ের গ্রেফতার হওয়ার সময়কার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় বোরাইয়ের কাছে মজুত থাকা বিস্ফোরক আর অস্ত্র নিয়ে জাওয়াহিরি বলেছে—

"জুনে সেগুলো (বিস্ফোরক আর গোলাবারুদ) তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। তখন থেকে দুদিন আগে সে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত সেগুলো তার কাছেই ছিল, আমি পুলিশকে সেসব জানিয়েছিলাম।"

জাওয়াহিরির জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল, এবং যা তাকে মানসিক ও নৈতিকভাবে সবচেয়ে আঘাত দিয়েছে তা হলো উচ্চ মিলিটারি কোর্টে, ৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ সালে তাকে ক্বামারিসহ তার অন্য সহকর্মী অফিসার আবদেল আযীয আল-জামাল, আওনী আবদেল মাজীদ, সাইয়িদ আব্বাস এবং জামাল রাশিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

মিলিটারি কোর্ট তাকে ক্বামারি আর তার সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চায়। সে উত্তর দেয়, "মেজর এসাম আল-ক্বামারির সাথে আমার প্রথম

দেখা হয় ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অক্টোবরে গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নিয়মিত তার সাথে দেখা করতাম।"

তাদের সম্পর্ক কী ধরনের ছিল সে সম্পর্কেও কোর্ট জানতে চায়। জাওয়াহিরি জানায়, সে জানত, ক্বামারি আর্মি থেকে পালিয়েছে এবং সে ক্বামারিকে সাহায্য করছিল।

'সে মাঝেমধ্যে আমার ক্লিনিকে আসত আমার সাথে দেখা করতে। আমি তাকে একটি ফ্ল্যাট খুঁজে দিয়েছিলাম, টাকা দিয়েছিলাম। যে পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেটাও আমিই দিয়েছিলাম, সাথে আরও পাঁচটি পিস্তল, দুটো মেশিনগান এবং বেশ কিছু বুলেট দিয়েছিলাম, আমি মনে করতে পারছি না কতগুলো বুলেট ছিল।'

সে কোর্টকে ক্বামারি আর আবদেল আযীয আল-জামালের কাজকর্ম সম্পর্কে আরও তথ্য দিয়েছিল।

নিশ্চয়ই, জাওয়াহিরির স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হওয়ার কারণ ছিল কারাগারে ভয়ঙ্কর শারীরিক-মানসিক অত্যাচার। যদিও ইসলামিক ফিকহ (ইসলামিক আইনশাস্ত্র) অনুযায়ী তার স্বীকারোক্তির পেছনে অজুহাত আছে। তারপরও এটা তার জন্য তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সে সহজে পরিত্রাণ পায়নি, এই অভিজ্ঞতা তার মতো একজন নেতাকে নাড়া দিয়েছিল। সে মিশর ত্যাগ করা ভালো মনে করল এবং সে তার লক্ষ্য সম্পর্কে জানত। সে ইতোমধ্যে আফগানিস্তান দেখে এসেছিল ১৯৮০ সালে, যখন সে সাইয়িদা যাইনাব হাসপাতালে চাকরি করত। সাইয়িদা যাইনাব হাসপাতাল মুসলিম ব্রাদারহুড মেডিকেল সোসাইটির অধিভুক্ত ছিল। সেখানে চাকরি করা অবস্থায় আফগানে মেডিকেল সেবা দেওয়ার জন্য মেডিকেল গ্রুপের সাথে সে গিয়েছিল। এটা তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল জিহাদের অপার ভূমি দেখে আসার। আফগানিস্তানে প্রথম পা রাখার সময়ই সে বুঝতে পেরেছিল এটা জিহাদের জন্য উত্তম জায়গা।

অনেকেই জাওয়াহিরি আর তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ওসামা বিন লাদেনের বক্তৃতা আর বাগ্মীতার তুলনা করে থাকেন। তারা বলে থাকেন, অল্প কথায় মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়ার সক্ষমতা বিন লাদেনের আছে,

তিনি জাওয়াহিরির চেয়ে ভালো বক্তা। এটা সত্য যে, জাওয়াহিরি বিন লাদেনের চেয়ে ভালো বক্তৃতার গুণটি কম পেয়েছে। যদিও জাওয়াহিরির কাউকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করতে এবং দলে লোক ঢুকানোর বৈশিষ্ট্য ভালোই আছে। কারণ, তার বুদ্ধি সুপরিকল্পিত এবং লক্ষ্য পরিষ্কার। অন্যদিকে, বিন লাদেন যে সম্পর্কে কথা বলে—বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে আমেরিকার উপস্থিতি, ফিলিস্তিনের ইহুদিদের প্রতি আমেরিকার সহযোগিতা—এসব অনেক বছর ধরেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব তার মূল চিন্তার কারণ হওয়ায় বিন লাদেন এসব নিয়ে বলার সময় সুন্দর করে বলতে পারে। বিন লাদেনের সাথে মিত্রতার কারণে জাওয়াহিরি আজকাল এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে, তাই এগুলো তার কাছে নতুন। তাই জাওয়াহিরির বাগ্মিতা বিন লাদেনের চেয়ে কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

জাওয়াহিরি বিচক্ষণ পরিকল্পনাকারী। ১৯৯৩ সালে কায়রোর আল-হায়াত[৬৮] পত্রিকার কাছে একটি ফ্যাক্স পাঠায়। ফ্যাক্সে জেনেভার একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলন করবে জানিয়ে পুরো দুনিয়াকে ভাবতে বাধ্য করেছিল যে সে সুইজারল্যান্ডে বসবাস করছে। পরে হুট করেই সংবাদ সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করে। এর পেছনের কারণ হিসেবে জানায়, সে তথ্য পেয়েছে যে মিশরীয় প্রশাসন তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে। কয়েক বছর পর বেরিয়ে আসে, সে যখন আফগানিস্তানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সুদান গিয়েছিল তখন এই গুজব রটায়, যাতে কেউ তার অবস্থান নির্ণয় করতে না পারে আর শান্তিপূর্ণভাবে আফগানিস্তানে যেতে পারে।

---

৬৮. লন্ডন ভিত্তিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরবি সংবাদপত্র।

আফগানিস্তানে আল-কায়েদা

জাওয়াহিরি মিশর ছেড়ে আফগানিস্তানে স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর যখন সে গ্রেফতার হয় এবং জিহাদ কেসে অভিযুক্ত হয় তখন। রিলিফ অপারেশনের জন্য সে আফগানিস্তান দুবার দেখতে গিয়েছিল, ১৯৮০ আর ১৯৮১ সালে। সে সেখানে ছয় মাস থেকেছিল, এটা সেই পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার দারুণ সুযোগ ছিল। জাওয়াহিরি তার শেষ বইয়ে লিখেছে,

১৯৮০ সালে আফগানের যুদ্ধের ময়দানের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, এই সংগ্রাম মুসলিম উম্মাহর জন্য কতটা মূল্যবান, বিশেষ করে জিহাদি আন্দোলনের জন্য। বুঝেছি, এটার বিন্যাস ও রীতিনীতি নির্ধারণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমার প্রথম পরিদর্শনের চার মাস অবস্থানের পর ফিরে এসে আমি আবার আফগানিস্তান যাই ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে। সেবার আমি আরও দুমাস সেখানে ছিলাম, তারপর কিছু জরুরি কারণে মিশরে ফিরে আসি। সেখানে আমাকে তিন বছর কারাগারে থাকতে হয়, ১৯৮৪ পর্যন্ত। আফগান জিহাদে ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝির আগে ফিরে আসতে পারিনি। ময়দানের বিভিন্ন লোকের সাথে আমার বন্ধন ও লেনদেনের ফলে আমি কিছু ভয়াবহ বাস্তবতা আবিষ্কার করলাম। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এই আন্দোলনের জন্য এমন উর্বর জমি দরকার, যেখানে এর বীজ রোপণ করলে চারা বেড়ে উঠতে পারবে এবং যুদ্ধ, রাজনীতি এবং সংগঠনের মাধ্যমে দলগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

১৯৮১ সালে মিশরে জাওয়াহিরির দলের কথা প্রকাশ পেলে সে যেই উভয়সঙ্কটে পড়ে সেটা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ ছিল আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানে দলে লোক ভেড়ানো ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও সহজ ছিল তার জন্য। কারণ, সেখানে তাকে নিয়মিত নজরদারির ভেতর রাখার মতো কেউ ছিল না। এছাড়াও এটা তার জন্য উপকারী ছিল, মিশরের বুদ্ধিজীবীদের এড়ানোর জন্য; যারা হয়তো তার পন্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করত। মিশরের মতো মুক্ত মানসিকতার দেশে মিডিয়া শুধু ক্ষমতাসীনদের নিয়েই সমালোচনা করে না, বিরোধিতাবাদীদের নিয়েও করে, বিশেষ করে ইসলামিক আন্দোলনগুলোকে নিয়ে। অন্যদিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর আফগান-সমাজ এসব বিষয়ে প্রায় নিশ্চুপ থাকে। এই ইতিহাস মুসলিম যুবকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে, সেই শক্তির সাথে যেটা বর্তমান বিশ্বের শক্তির কেন্দ্র—আমেরিকা। সেখানে সম্পদও বেশি ছিল। যার কারণে মিশরীয় সরকারকে উৎখাত করতে তার সমগোত্রীয়দের আফগানিস্তান থেকে জনবল পাঠানোর ইচ্ছা ছিল তার। এভাবেই সে তার আফগানিস্তানে উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে মিশরে অপারেশন চালাতে পারত।

কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে জাওয়াহিরি মিশরে তার দলের দ্বারা সংগঠিত অপারেশনের সাথে জড়িত ছিলেন না। কারণ, এই কেসে তার দলের সদস্যদের অভিযুক্ত করা হলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি। প্রাক্তন অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হাসান আল-আলফি[৩] এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আতিফ সিদ্দিকীর[৪] ব্যর্থ হত্যা চেষ্টা কেস সহ অন্যান্য কেসের বিষয়েও একই কথা। অন্য পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন, মিশরীয় সরকার অন্য কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেনি। যখন জাওয়াহিরি জেনেভায় বাস করছিল, তখন মিলিটারি কোর্টের শুনানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো মেনে নেয়নি। মৃত্যুদণ্ডের রায় তাকে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ দিতে পারে। এটা সম্ভব যে, মিশরীয় প্রশাসন তাকে অভিযুক্ত করেনি। কারণ, তারা সে পরিস্থিতিতে ভীত ছিল। কারণ, মৃত্যুদণ্ড তাকে সহজে অন্য দেশে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

জাওয়াহিরির সমর্থকরা বলতে পারে, ১৯৯৮ সালের আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসে মিশরীয় প্রশাসন জাওয়াহিরির অবর্তমানেই তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে, যেটা ঠিক হয়নি। এর পেছনে তাদের যুক্তি— আইনিভাবে নিজেকে বাঁচানোর জন্য জাওয়াহিরি সেখানে উপস্থিত ছিল না। মিশর সরকার অন্য কেসে তাকে অভিযুক্ত করেনি। এর পেছনে আরেকটি কারণ, যেসব সদস্য অপারেশন চালিয়েছিল, তারা তাদের নেতার বিষয়ে কোনো স্বীকারোক্তি দেয়নি। তবে আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসে জড়িতরা জাওয়াহিরির নেতৃত্বের বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসের অভিযুক্তরা কেন তাদের নেতার বিষয়ে জবানবন্দী দিয়েছিল এ বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যা আছে।

প্রথমত, ১৯৯৮ সালে নাইরোবি আর দারুস সালামে করা হামলাগুলোর পর পরিচালিত মিশরের অপারেশনগুলোর ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে দলের সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। মিশরের বাইরে আলবেনিয়ায় আটক হওয়াটা তাদের হতাশাকে বাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা তাদের জন্য অপ্রীতিকর ও অপ্রত্যাশিত ছিল। ইসলামিক জিহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাওয়াহিরির ডান হাত আহমেদ সালামা মুবারকও আটক হয়েছিল। তার কাছ থেকে প্রশাসন একটি ল্যাপটপ জব্দ করে, যেটাতে মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের অনেক সদস্যের নাম ছিল। যার কারণে শতাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়। জাওয়াহিরির পরিবার বিশ্বাস করে, ১৯৮১ বা ১৯৯৯ সালের আগে তার পুরো জীবনে সে কোনো অপরাধ করেনি। তার মামা মাহফুজ আযযাম দাবি করেন, আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসের বিচারকার্য পরিচালনা করা মিলিটারি কোর্টের সাধারণ জনগণের ওপর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি এই কোর্টের শাস্তি গ্রাহ্য করেন না। কারণ, সেখানে সে উপস্থিত ছিল না। আর তাকে নিজের সপক্ষে লড়ারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি এ বিষয়ে জোর দেন যে কোনো ইউরোপীয় দেশ মিলিটারি কোর্টের স্বীকৃতি দেয় না। তাই তারা সাজাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে। জাওয়াহিরির পরিবার জাওয়াহিরিকে এমন ব্যক্তি হিসেবে দেখে, যে

নিজের বিশ্বাসের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করে, সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনকে সাহায্য করতে আহ্বান করার মাধ্যমে সে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছে, জিহাদ করছে। আমেরিকা হামলার সাথে তার সম্পৃক্তার কথা তারা মেনে নেয় না। আযযামের মতে, এই ঘটনায় সে জড়িত ছিল না। কারণ, সে কোনো মিলিটারি নেতা নয়। সে প্লেন চালানো বিষয়ে পড়াশোনা করেনি, যার কারণে সে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় যুক্ত থাকতে পারবে।

আফগানিস্তানের বাইরে

আফগানিস্তানে জাওয়াহিরি তার দল গঠন করলে মুজাহিদরা (আক্ষরিক অর্থে 'জিহাদি, যোদ্ধা'। এখানে আফগানিস্তানের বিভিন্ন দলে যোগ দেওয়া আফগান বা বহিরাগতদের বুঝানো হচ্ছে, যারা ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে) ১৯৯২ সালে কাবুলে প্রবেশ করে। তখন 'সিবগাতুল্লাহ মুজাদাদি' মুজাহিদ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মুজাদাদি তার সাময়িক সরকারকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার এই চেষ্টা ব্যাপক বিরোধিতার মুখে পড়ে। এমনকি মুজাহিদদের কাছ থেকেও, বিশেষ করে বুরহানউদ্দিন রাব্বানী এবং তার বন্ধু আহমেদ শাহ মাসউদ আর গুলাবউদ্দিন হেকমতিয়ারের কাছ থেকে। মুজাদাদি বহিঃবিশ্বের কাছে, বিশেষ করে পাকিস্তান এবং আরব দেশগুলোর কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি চান না আরব-আফগানরা (আরব মুজাহিদিন, যেসকল আরব জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আফগানে এসেছিলেন) তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পরও নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে সে দেশে থাকুক। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক ইঙ্গিত, যার মাধ্যমে কিছু আরব রাষ্ট্র, যেমন মিশর আলজেরিয়াকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, যারা ভাবছিল তাদের যেসব নাগরিক আফগানে গিয়েছে, তারা আফগানিস্তানকে লঞ্চ প্যাড হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। মিশর ইতোমধ্যেই আরব-আফগানদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছিল। মিলিটারি কোর্টের মাধ্যমে তাদের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির রায় দেওয়া হয়। অনেককে মৃত্যুদণ্ড এবং আরও অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্নজনকে বিভিন্ন মেয়াদি শাস্তি দেওয়া হয়।

বুরহানউদ্দিন রাব্বানী রাষ্ট্রপতি হলে আরব-আফগানদের সঙ্কট আরও বেড়ে যায়। কারণ, বিভিন্ন মুজাহিদীন দল তখনও যুদ্ধ করছিল। কিন্তু আরব-আফগানরা এতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কারণ, তারা কোনো দলের নেতার পরিকল্পনার ওপরই আস্থা রাখতে পারছিল

না। তাদের দুশ্চিন্তা ছিল, এই বিবাদে তাদের দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আরব-আফগান নেতাদের এই ভয় আকাশচুম্বী হয়, যখন পাকিস্তান মিশরীয় সরকারের কাছে বেশ কজন মিশরীয় মৌলবাদীর তালিকা হস্তান্তর করে। তাদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ আব্দেল রাহমান আল-শারকাওয়ী। শারকাওয়ী প্রথম গোপন দল তৈরি করেছিলেন ১৯৬৮ সালে, সেই দলে জাওয়াহিরিও ছিলেন। তাকেও জিহাদ কেসে জাওয়াহিরির মতো অভিযুক্ত করা হয় এবং তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি তোরা কারাগারে ছিলেন। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়ার পর জাওয়াহিরির সাথে তিনিও দেশ ত্যাগ করেন।

ইয়েমেন ও সুদান: সাময়িক অবস্থা

অবশেষে আফগান নেতারা মুজাহিদদের থেকে জাওয়াহিরি ও বিন লাদেনের মতো যুদ্ধবাজ আরব-আফগান নেতাদের দিকে মুখ ঘুরালেন। এটা সহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন ঘটনাবলী আরব-আফগান নেতাদের এই দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে, বিশেষ করে সুদান আর ইয়েমেনে। ওসামা বিন লাদেন সুদানে কৃষি খাতে অনেক অর্থ বিনিয়োগ করে, যার কারণে পরে তাকে অর্থনৈতিক হয়রানির শিকার হতে হয়। তার অর্থ রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগে, যেটা অন্য আরব-আফগান নেতাদের সেখানে আসতে সহায়তা করে; যেমন, জাওয়াহিরি, থারওয়াত সালাহ শেহাতা এবং আবু ওবায়দা আল-বেনশারি, যিনি ১৯৮৫ সালে Lake Victoriaতে ডুবে যান। বিখ্যাত নেতা আহমেদ ইবরাহীম আল-নাগার, যাকে ২০০০ সালে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তিনি ১৯৯৩ সালে মিশর থেকে পালিয়েছিলেন। এটা ঘটেছিল যখন মিশরীয় প্রশাসন ইসলামিক জিহাদের অগ্রদূতদের গ্রেফতার করছিল। ইসলামিক জিহাদের নেতারা তার পালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবরকমের ব্যবস্থা করেছিল। তিনি বলেন,

আদিল আল-সুদানি (যাকে খান আল-খালিল কেসে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৯৮ সালে অভিযুক্ত করা হয়) আমাকে বলেছিল যে, দেশ থেকে পালানোর জন্য সে আমাকে অন্য কোনো নামের একটি পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দেবে। সে আবদেল রাহিম মোহাম্মদ নামের কারও পাসপোর্ট এনে দেয় এবং আমার ছবি নিয়ে যায়। সে আমাকে নুওয়াইবাদ থেকে একটি ফেরির টিকিট এনে দিয়েছিল এবং আমাকে জর্ডান যেতে বলেছিল—আম্মান থেকে বাসে করে জর্ডান রিভার হোটেলে যাও। সে আমাকে আরও বলেছিল যে, কিছু লোক হোটেলে আমার সাথে দেখা করবে। ১৮ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে আমি জর্ডান রিভার হোটেলে যাই। আমি জানতাম না যে কে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। পরদিন আমি মোহাম্মদ আল-দীবের কাছ থেকে কল পাই, যিনি গিজার

কারদাসার ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে আফগানিস্তান থেকে ফিরে মিশরীয় সরকারের সাথে যুদ্ধ করাকালীন তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

দীব আমাকে ইয়েমেন থেকে কল করেছিল। সে আমাকে প্লেনের টিকিট বুক করে সেখানে যেতে বলল। আমি তাকে আমার যাওয়ার দিনটির কথা জানিয়ে দিলাম। ১৯৯৩ সালের ২৩ অক্টোবর আমি চলে যাই। যখন আমি সানআ এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম, তখন দেখলাম, সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমাকে সানআর দক্ষিণ দিকে আল-সাওয়াদ নামক এলাকায় নিয়ে গেল, সেখানে আমরা একটি এক তলা বাসায় থাকতাম।

বাড়িটিতে ঢুকে আমি বুঝতে পারলাম, এখানে ইয়েমেনে বসবাসকারী কিছু যুবক থাকে। ইসলামিক জিহাদের অনেক নেতা সেখানে আমার সাথে দেখা করেছিল। যেমন, মোরগান সালেম, মোহাম্মদ আল-জাওয়াহিরি, আহমেদ সালেম মাবরুক ও থারওয়াত সালাহ শাহেতা। তারা সবাই এটা নিশ্চিত করতে এসেছিল যে সেখানকার সব সদস্য ভালো আছে এবং আমাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে কি না। সেই বাড়িতে বসাবাসের সময় আমি জানতে পারি, দলের সেই যুবকেরা আফগানিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। তারা আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছে। আমি আরও জানতে পারি, দলের নেতারা ইয়েমেনে আশ্রয় নিয়েছে। যেখানে তারা তাদের সদস্যদের লুকাতে এবং তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। আমি যেই দলের সাথে ছিলাম, তারা মোহাম্মদ শারাফের কাছে আমার আইনশাস্ত্র পড়ার ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে থাকার কিছুদিন পর দীব আমাকে জানিয়েছিল যে এই দলটি সানআকে তাদের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের জায়গা হিসেবে বেঁচে নিয়েছে, যাদের পরবর্তীতে মিশরে অপারেশন চালানোর জন্য পাঠানো হবে। মিশর অপারেশনের জন্য তাদের প্রস্তুতি শেষ হলে তাদের ইয়েমেনের তাইজ শহরে পাঠানো হবে।

নাগার তার স্বীকারোক্তির ২০ নম্বর পৃষ্ঠায় বলে, আরব-আফগানরা আফগানিস্তান ছেড়ে যায় যখন কাবুল মুক্ত হয়।

ইয়েমেনে অবস্থানের প্রথম দিকেই আমি বুঝতে পারি, এটা আফগানিস্তানের পরিবর্তে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যখন পাকিস্তান আরবদের বিরোধিতা করা শুরু করে। এই দমনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দলের নেতাকর্মীরা একটি উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে, যেখানে তারা তাদের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবে। উপযুক্ত জায়গাটা হতে হবে মিশরের কাছাকাছি। যেমন, ইয়েমেন, সুদান এবং জর্ডান। কিন্তু সবচেয়ে ভালো জায়গাটি ছিল ইয়েমেন। কারণ, এটার বড় মিশরীয় কমিউনিটি আর এখানে বসবাস করাও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল। তাছাড়া, সেসময় ইয়েমেনের দক্ষিণ এবং উত্তর দিক দুটোর মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল।

অপরদিকে, সুদান খুব বেশি কাজ দিতে পারত না এবং সেখানে বসবাস করাও ব্যয়বহুল। তাছাড়া নাগারের মতে, ইসলামিক জিহাদ দলের পুর্নগঠনে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ইয়েমেন সুদানের চেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিল। এখনও জাওয়াহিরির মতো কয়েকজন নেতার কাছে সুদান আকর্ষণীয়। নাগার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছে, যেটা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারবে জাওয়াহিরি–কেন সুদানকে আস্তানা হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছিল সে।

"ইয়েমেনে অবস্থান করেও আমি এটা বলতে পারব না যে ইয়েমেন সরকারের সাথে ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল, যেমনটা সুদানে ছিল। সেখানে দলের সদস্যদের সাথে সুদানী সরকারের সম্পর্ক ছিল।"

জাওয়াহিরি ইয়েমেনকে লঞ্চিং প্যাড হিসেবে পছন্দ করেছিল, যেখান থেকে সে মিশরে সশস্ত্র অপারেশন চালাতে পারবে। তারপরও সে তার সদস্যদের ইয়েমেন থেকে সুদানে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল, মিশরের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আতেফ সিদকির ব্যর্থ হত্যা চেষ্টার পর।

নাগার নিজের সুদান যাওয়া সম্পর্কে বলে, ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে মোরগান সালেম আমাকে ডেকে বলে, আমাকে সুদান যাওয়ার আদেশ

দেওয়া হয়েছে। খার্তুম যাওয়ার জন্য আমি প্লেনের টিকিট কাটলাম। এয়ারপোর্টে মোরগান সালেম এবং নাসর ফাহমি (যিনি ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আমেরিকার বোমা হামলায় নিহত হন) আমাকে নিতে এসেছিল। তারা আমাকে খার্তুমের রিয়াদ এলাকার একটি তিন তলা বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি সেখানকার নিচ তলায় এক রাত কাটিয়েছি, সেখানে বেশ কিছু যুবকও ছিল। পরদিন মরগান সালেম আমাকে একটি প্রাইভেটকারে নিয়ে খার্তুমের একটি বাড়িতে জাওয়াহিরির সাথে দেখা করতে যায়। থারওয়াত সালাহও আমাদের সাথে এসেছিল। আমি জানি না সে বাড়িটা আসলে কোথায় ছিল। কিন্তু আমার মনে পড়ে, পুরনো একতলা একটি বাড়ি ছিল। এটাকে কোনো বাড়ির মতো দেখাচ্ছিল না, বরং অফিস মনে হচ্ছিল। সেই সাক্ষাতে মরগান সালেমের উপস্থিতেই আমি জাওয়াহিরির সাথে সিভিল কমিটি নামক দলের বিষয়ে কথা বলছিলাম এবং সে ভবিষ্যতে কী করা উচিত বলে মনে করে সে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। সে বলেছিল, অগ্রদূতদের ধরপাকড় কেসের পর নতুন পদ্ধতিতে এগুনো উচিত এবং পুরনো তথ্যকে উপেক্ষা করা উচিত।

আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন

তালিবানরা রাষ্ট্রপতি রাব্বানিকে সরিয়ে কাবুল দখল করে নিলে জাওয়াহিরি দেখে তার প্রিয় স্থান আফগানিস্তানে ফেরার সুযোগ এসে গেছে। আফগানিস্তানের অসমতল পাহাড়ি এলাকায় জাওয়াহিরি নিরাপদ বোধ করত। সেখানে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের অনুসারীদের সামরিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত বক্তৃতা দিতে পারত। নাগার বলেন, জাওয়াহিরি, তার ভাই মুহাম্মদ, আহমেদ আগু আল-খায়ের, আহমেদ সালামা মুবরাক এবং থারওয়াত সালাহ শেহাতা আজারবাইজান হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, যখন তালিবান তাদের ভূমিকে আরব মুজাহিদদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ইসলামিক জিহাদের মিডিয়া কমিটি তালিবান সম্পর্কে একটি পত্রিকা প্রচার করে, যেখানে তালিবানের গুণাবলি এবং মৌলবাদী ধর্মীয় দিক থেকে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দলটির শরিয়াহগত মর্যাদার কথা উল্লেখ ছিল। সেখানে আরও ছিল, ১৯৯৬ সালের শুরু থেকেই ইসলামিক জিহাদ তালিবানের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল। আফগানের ৯৫ শতাংশ ভূমি তালিবানের দখলে চলে এলে ওসামা বিন লাদেন তালিবান নেতাদের সাথে একটি চুক্তি করেন–তাদের মধ্যে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরও ছিলেন—ইসলামিক জিহাদের কিছু লেখনীতে যাকে আমিরুল মুমিনীন বা বিশ্বাসীদের নেতা বলা হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিন লাদেন তালিবান নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে অবস্থান এবং আরব-আফগানদের সমৃদ্ধির অনুমতি পায়। ইসলামিক জিহাদের নেতারা আফগানিস্তানে ফিরে আসে এবং অন্য সদস্যদেরও সেটা করতে বলে। মিশর বা অন্য আরব দেশ কেন্দ্রিক বিভিন্ন ইসলামি দলও আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ইসলামিক জিহাদের মতো অন্য দলগুলো মর্যাদা পায়নি। কারণ, সেই চুক্তির কারণে ওসামা বিন লাদেনের সাথে তালেবানের আনুষ্ঠানিক মিত্রতা ছিল। তালিবান আরব-আফগানদের আফনিস্তানের অন্য বিরোধী দলগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করেনি। তাছাড়া, অনেক আরব-আফগান আল-

কায়েদার সাথে যুক্ত না হয়েও সেখানে বসবাস করছিল, যেটা ওসামা বিন লাদেন দ্বারা পরিচালিত ছিল বা ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত ফ্রন্ট দ্বারা পরিচালিত ছিল।

জাওয়াহিরির মতবাদের পরিবর্তন: দূরের এবং কাছের শত্রু

ইসলামিক জিহাদি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার এক বছর পর আয়মান আল-জাওয়াহিরি মনে করত, পরিবর্তন আনার একটিই উপায় আছে—সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে সরকারের উৎখাত করা। পরবর্তীতে সে মিশরীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করা শুরু করে। যদিও প্রথমদিকে আবদেল আল-যোমর যখন এধরনের কাজের পরিকল্পনা করছিল আনোয়ার সাদাত হত্যার পর, তখন জাওয়াহিরি এর বিরোধিতা করেছিল। সে যোমরকে সেই হত্যাকাণ্ড নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বলে। ১৯৮০ সালের শেষ দিকে যখন সে আফগানিস্তানে ছিল, তখন জামাআ আল-ইসলামিয়া এবং মিশরীয় সরকারের সংঘর্ষে আপত্তি জানায়। জামাআ আল-ইসলামিয়াকে জনমত গঠন এবং অর্থনৈতিক সমস্যা—যেটা মিশরীয় সমাজের অন্যতম সমস্যা—এ বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে বলে। সে ব্যাখ্যা করে, প্রশাসনকে জ্বালাতন করা তাদের কঠিন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং দলের লোকদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলবে আর ভবিষ্যৎ অপারেশনের জন্য রক্ষিত অস্ত্রকে বাজেয়াপ্ত করাবে।

জাওয়াহিরির অনুসারীদের মধ্যে বিশেষত তরুণরা জাওয়াহিরিকে আহ্বান জানায় যে কেবল জামাআ আল-ইসলামিয়াকেই সক্রিয় জিহাদি কার্যক্রম চালাতে দেওয়া উচিত হবে না। তারা আফগানিস্তানে নেওয়া ভালো মিলিটারি ট্রেনিংকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিল। জাওয়াহিরি তাদের চাপের কাছে হার মানে। তার উত্তম ফয়সালার বিরুদ্ধে গিয়ে সে তার অনুসারীদের কয়েকজনকে মিশরীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অপারেশন চালানোর আদেশ দেয়। প্রথম অপারেশন ছিল ১৯৯৩ সালে প্রাক্তন মন্ত্রী হাসান আল-আলিফের ব্যর্থ হত্যা চেষ্টা। বেশ কিছু অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। যেমন, প্রাক্তন মন্ত্রী আতেফ সিদকির হত্যা চেষ্টা, তারপর সিদকি হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সাইয়েদ ইয়াহিয়ার হত্যা। জাওয়াহিরির গ্রুপ ইয়াহিয়াকে টার্গেট বানিয়েছিল। কারণ, সে সিদকি হত্যা পরিচালনাকারী আল-সাইয়েদ সালাহের বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েছিল।

অভ্যুত্থান সহজ করার প্রস্তুতি হিসেবে জাওয়াহিরি ধারাবাহিকভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মোকাবিলা করা থেকে বিরত হয়। যুদ্ধকৌশলে তার সচেতনতা বাইরে থেকে মিশরে আক্রমণ করার মাধ্যমে চাঙ্গা হয়ে উঠে। প্রশাসনের সাথে সংঘাত তাদের দলে মিলিটারিদের মধ্য থেকে সদস্য যোগ করার বিষয়টি কঠিন করে দেয়, যেহেতু সেখানে ইসলামি আন্দোলনের সাথে জড়িতদের অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। মিশরে তখন তার দলের সদস্যদের সাথে সরকারের সংঘর্ষ বাড়ছিল, বেশিরভাগই সোভিয়েতের সাথে লড়াই করা আফগান ফেরত যোদ্ধা ছিল আর তারা সামরিক অপারেশন মিশরে স্থানান্তর করার জন্য প্রস্তুতও ছিল। তার অনুসারীরা বুঝতে পারে যে জামআ আল-ইসলামিয়ার সম্পদ সীমিত। সে কারণে তারা মিশরের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন—ব্যাংক এবং পর্যটন শিল্পের ওপর আক্রমণ চালায়।

এটা গোপন কথা নয় যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে জাওয়াহিরি ওসামা বিন লাদেনের থেকে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা পেয়েছিল এবং তার অনুসারীরা বিশ্বাস করত যে ইসলামিক জিহাদ জামাআ আল-ইসলামিয়াকে অতিক্রম করে যাবে।

অবশেষে জাওয়াহিরির সুষ্ঠু পরিচালনায় সাময়িক কিছু সংঘাত মিশরে সংগঠিত হয়। যা তার রীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত করে।

যদিও আরব-ইসরাঈল দ্বন্দ্ব আরব এবং ইসলামি দেশগুলোর মাথাব্যথার প্রধান কারণ, জাওয়াহিরি এটাকে প্রান্তীয় বিষয় হিসেবে দেখে এবং সে এটার জন্য অর্থনৈতিক বা জনবল দিয়ে সাহায্য করেনি। তবে সে নৈতিকভাবে এটার সমর্থন করে। তার নৈতিক এবং মিডিয়াগত সমর্থন প্রকাশ পায় ফাতহি আল-শাকাকির মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর মাধ্যমে। সে লিখেছিল—

> *আমাদের ভাই ডা. ফাতহি আল-শাকাকির শাহাদাতে মিশরের ইসলামিক জিহাদ সমবেদনা জানাচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তার কাজ কবুল করে নেন এবং তাকে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করেন।*

আমরা তার সহকর্মীদেরও সমর্থন করি। আমরা তার সহযোদ্ধা এবং অন্য মুজাহিদদের স্মরণ করে দিতে চাই—জিহাদ শহিদ হওয়ার একটি মাধ্যম এবং ফাতহি আল-শাকাকি সেই সম্মান পেয়েছেন। আমরা তাকে একজন সত্যিকারের মুজাহিদ হিসেবে চিনতাম, যিনি অপমানকর চুক্তি এবং আত্মসমর্পণ প্রত্যাখান করে ইহুদিদের সাথে লড়ে গেছেন। জিহাদের পথে চলার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

জাওয়াহিরি বিশ্বাস করত যে জেরুসালেমে যেতে হলে কায়রোকে অতিক্রম করতে হবে। এটাই সবসময় তার উত্তর ছিল—ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপারেশনে কেন সে ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ এবং হামাসকে সহযোগিতা করে না এর জবাবে। সে সবসময় বলত, জিহাদের একমাত্র গ্রহণযোগ্য রূপ হলো সশস্ত্র জিহাদ এবং সেটা সত্যিকারের মুসলিমের উচিত প্রথমে অভ্যন্তরীণ শত্রু বা কাছের শত্রুর দমন করা এবং পরে বহিরাগত বা দূরের শত্রুদের মোকাবিলা করা।

জাওয়াহিরি তার কাছের এবং দূরের শত্রুর চিন্তা আলোচনা করেছে '*The Way to Jerusalem Passes Through Cairo*' নামের প্রবন্ধে, যেটা ১৯৯৫ সালে আল-মুজাহিদিন পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে লিখেছে—

"মিশর এবং আলজেরিয়া মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, কায়রো মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জেরুসালেম মুক্ত[১] করা যাবে না" মানে প্রধান শত্রু হচ্ছে মুসলিম শাসকেরা, যারা শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে না। ইসরায়েলের সাথে আসন্ন মোকাবিলার প্রস্তুতি না নিয়ে মিশরে অপারেশন চালানোর জন্য জাওয়াহিরি ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়। আসওয়ানের জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতা খালেদ ইব্রাহিম ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে তার বিরুদ্ধে চলা বিচারকার্যের সময় ইসলামি আন্দোলনের বেশ কয়েকজন সদস্যকে মিশরে সকল প্রকার অপারেশন বন্ধ করার আহ্বান জানায়। অনেক ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে ইব্রাহিমের আহ্বানকে সমর্থন জানায়। লন্ডনভিত্তিক আল-হায়াত পত্রিকা থেকে পরদিন ইব্রাহিমের বক্তব্যের ছাপানো হয়। ইব্রাহিম বলে—

কোর্টের এই পবিত্র ভূমিতে আমি মিশরের প্রতিটি নাগরিককে, বিশেষ করে অভিজাতদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান করছি। আমাদের এই রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে সেই রক্ত নিয়ে দাঁড়ানো উচিত, যে রক্ত দিয়ে যুগ যুগ ধরে আমরা এই সভ্যতা গড়ে তুলেছি। এই একই লোকেরা একসময় এদেশের গৌরব গড়ে তুলেছিল, যখন আমাদের প্রিয় মিশর পূর্বের মধ্যমণি এবং নেতায় পরিণত হয়েছিল। চলুন আমরা আমাদের টুটা অঙ্গকে জুড়ি, যেটা আমাদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিভিন্ন রকম শত্রু—বিশেষ করে ইসরায়েলের থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে, যারা আন্তর্জাতিক জায়ানিজমের সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যারা জেরুসালেমে সোলাইমানি মন্দির বানানোর স্বপ্ন দেখে এবং নীল থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত ইহুদিদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে আছে আমেরিকা, যারা এমন একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেটা ভবিষ্যতে পুরো পৃথিবীকে মেনে চলতে হবে।

ইব্রাহিমের ঘোষণাকে সামনে রেখে গণমাধ্যমে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—

"আমাদের মুসলিম উম্মাহ তিন দিক থেকে ঝুঁকিতে আক্রান্ত—জায়ানিজম, ক্রুসেডার এবং কমিউনিজম; যেগুলোর সমস্যা বেড়েই চলেছে। উম্মাহ এখন আঁধারে নিমজ্জিত। ইসরায়েল এখনও তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে এবং তা বাস্তবায়নে লেগে আছে। তারা আরবের বিভিন্ন মুজাহিদ দল নিধন করছে এবং গাজা, জেরিকা ও পশ্চিম তীরের বিভিন্ন দল, যেমন—হামাস ও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের পিছু লেগে আছে। এরা লেবাননের হিজবুল্লাহকে শেষ করে দেওয়ারও চেষ্টা করছে। আর সম্প্রতি ইরানকে প্রতিরোধ করার জন্য তুর্কির সাথে কৌশলগত চুক্তিও করেছে। এদিকে গোলানও তাদের দখলে আছে।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমরা এমন বাস্তবতায় এসে পড়েছি, যেটা ইসরায়েলকে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করার সুযোগ দেবে। সে কারণে আমি সামরিক অপারেশনগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য বহিরাগত ইসলামিক আন্দোলনের নেতাদের আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, কিন্তু জাওয়াহিরি ইব্রাহিমের আহ্বান এবং এতে আমার সমর্থনকে মিডিয়া প্রোপাগান্ডা হিসেবে বিবেচনা করেছে।"

১৯৯৬ সালের ২০ মে জাওয়াহিরি একটি বক্তব্য প্রকাশ করে। তাতে সে মিশরীয় সরকারের সাথে যুদ্ধ বন্ধের ইচ্ছায় অনীহা প্রকাশ করে এই বলে যে, জামাআ আল-ইসলামিয়ার প্রধান ভুল হলো এটি অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং বহিরাগত শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করে। উদাহরণ হিসেবে সে ব্রিটিশ এবং বাদশাহ ফারুক, আমেরিকা এবং জামাল আবদেল নাসেরের শাসনামলের প্রথম যুগ এবং বর্তমানে সোভিয়েত এবং নাসের পরবর্তী শাসনামলের তুলনা দেয়। সে ইহুদি এবং সাদাতের উদাহরণও আনে। সে আরও বলে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিকট শত্রু অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—"তোমরা নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"[৬৯] সে তার বক্তব্য এই বলে শেষ করে—

পরিশেষে, আপনাদের মতো বিজয়ীদের বলছি, সরকারকে কোনো সময় সুযোগ দেবেন না এবং মুসলিম যুকবদের ফিরিয়ে আনবেন না। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নতুন একটি ফ্রন্ট খুলেছে। তারাই ইউরোপা হোটেল[৭০] এবং খান আল-খালিলিতে ইহুদি পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রথম হামলা জামাআ আল-ইসলামিয়া থেকেই হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।

১৯৯৮ সালে জাওয়াহিরি পুরো পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য নতুন একটি আন্তর্জার্তিক ফ্রন্ট গঠন করে। সেই ফ্রন্ট ফতোয়া দেয় যে,

---

৬৯. আত তাওবাহ (১১: ১২৩)

৭০. ১৯৯৬ সালে ইউরোপা হোটেলের বাইরে ইসরায়েলি মনে করে কয়েকজন গ্রিক পর্যটককে গুলি করা হয়েছিল।

মুসলিমদের উচিত, আমেরিকানদের হত্যা করা। চাই সে সামরিক হোক অথবা বেসামরিক। আর তাদের অর্থ নিয়ে নেওয়া। ফতোয়ায় আরও বলা হয়—প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের জন্য এই কাজ করা ফরজ। এটা জাওয়াহিরির দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। এই ফতোয়া যুদ্ধকে নিকট শত্রুর থেকে আমেরিকা আর ইসরায়েলের মতো দূরের শত্রুদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯৭ সালে জাওয়াহিরির লেখায় কিছু ইঙ্গিত ছিল, যা বিশ্লেষকদের ভাবতে বাধ্য করে যে তার দর্শনে পরিবর্তন চলছে, যা তার পন্থায় পরিবর্তন আনবে। সে ফিলিস্তিনের সমস্যা এবং বিশেষ করে আরব-ইসরায়েল বিরোধের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করে। ১৯৯৭ সালে মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের বুলেটিনে সে একটি প্রবন্ধ লিখে, যার শিরোনাম ছিল *"আমেরিকা এবং কায়রোতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ"*। এই প্রবন্ধে সে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত একটি বার্ষিক রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে, যাতে ইসলামিস্ট এক্টিভিস্ট এবং নেতাকর্মীদের নিয়ে রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং খান খালিল কেসের বিচারকার্যে এই রিপোর্ট অনুসরণ করা হয়। এই প্রবন্ধ থেকেই প্রথম জাওয়াহিরি এবং নতুন আমেরিকা বিরোধী জিহাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নভেম্বর ১৯৯৭ সালে সে আরেকটি প্রবন্ধ লিখে *'আমেরিকা এবং ক্ষমতার ভ্রান্তি'* শিরোনামে। এই প্রবন্ধে সে বলে, আমেরিকার শক্তি থাকলেও তাকে চূড়ান্ত আঘাত করা সম্ভব। *'মুসলিম উম্মাহ, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে ঐক্যবদ্ধ হও'* শিরোনামের প্রবন্ধে তার পরিবর্তন পরিষ্কার হয়, যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে মুসলিমদের আমেরিকানদের টার্গেট বানাতে বলা হয়েছে।

জাওয়াহিরির পন্থায় পরিবর্তন আসার কারণ

১. উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে পরিচালিত সবগুলো অপারেশন বানচাল হয়েছিল। যেমন—মন্ত্রী হাসান আল-আলিফকে হত্যা করার উদ্দেশে নাজীহ নোসিহি রাশীদ ও দিয়া আল-দীন একটি আত্মঘাতি অপারেশনে অংশ নেয়। উভয় ঘাতকই সেই অপারেশনে মারা যায়, কিন্তু আল-আলিফ বেঁচে যায়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আতিফ সিদ্দিকী হত্যা অপারেশনেও ব্যর্থ হয় দলটি। এই অপারেশনটি আল-সায়্যিদ সালাহ এবং ইয়েমেন থেকে আসা অন্য সদস্যদের নিয়ে পরিচালিত হয়। এই অপারেশনে ভুলবশত শায়মা নামের একটি বাচ্চা নিহত হয়। শায়মার মৃত্যু জনমতকে ইসলামিক জিহাদের বিরুদ্ধে নিয়ে যায়। সিদকি হত্যাচেষ্টার একমাত্র সাক্ষী, গাড়ির দোকানের মালিক সাইয়েদ ইয়াহিয়াকে কালিউবিয়াতে হত্যা করা হলে জনগণের ক্রোধ বেড়ে যায়। এই অপারেশন কেবল দলের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণাই বাড়িয়েছে।

২. দলের সদস্যদের গ্রেফতার হওয়ার হার বেড়েই চলছিল। পরিচালনাসংক্রান্ত কিছু ভুল মিশরে অবস্থানকারী সদস্যদের গ্রেফতার হওয়ার কারণে পরিণত হয়। অসংখ্য ব্যর্থ অপারেশনও আটক হওয়ার অন্যতম কারণ। এ কারণে বিশেষ করে প্রশাসনের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের লিস্টে নাম না থাকা অনেক গোপন সদস্যও গ্রেফতার হয়। যেমন—১৯৯৩ সালে তারা আরেকটি অপারেশনে ব্যর্থ হয়। এই অপারেশনে তাদের একজন সদস্য ইমবাবা থেকে একটি ট্রাক চুরি করে একটি মিলিটারি দলের অস্ত্র ও গোলাবারুদ চুরি করার পরিকল্পনা করেছিল। তাদের এই চেষ্টায় ট্রাকের চালক এবং তার সহকারী নিহত হয়; পাশাপাশি তাদের দলের প্রায় ৮০০ সদস্য আটক হয়। তাদের মধ্যে মাজদি সালেম উল্লেখযোগ্য, যে কায়রোর ইসলামি জিহাদের নেতা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া, শারিকিয়া এবং বেহিরিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গ্রেফতার হয়, যাদের নাম কর্তৃপক্ষের সন্দেহের তালিকায় ছিল না।

ইঞ্জিনিয়ার সোলাইমান নাসের আল-দীনকেও ঐ দলের মিশরের নেতৃত্ব স্থানীয় সদস্য হিসেবে গ্রেফতার করা হয়।

৩. ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে দলটির পতন ঘটতে থাকে বিশেষত এর অর্থনৈতিক সম্পদের অভাবে। কারণ, সেসময় তাদের অপারেশন পরিচালনা আর ইয়েমেন ও সুদানে এর নেতা এবং সদস্যদের বসবাস খরচ বেড়ে যাওয়া। জাওয়াহিরির কাছে দলের নেতাদের বেতন-ভাতা দেওয়ার মতো অর্থ ছিল না। সেসময় দলের কয়েকজন সদস্যের ওপর অর্থনৈতিক পুঁজি খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দলের অর্থের ব্যবস্থা করতে কয়েকজন নেতাকর্মী বির্া [illegible] াতা সংস্থার হয়ে আলবেনিয়ায় চাকরি করতে যায়। রিলিফ ওয়ার্কার হিসেবে প্রাপ্ত বেতনের একটি অংশ তারা গ্রুপের ফান্ডে দিত।

এই অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে জাওয়াহিরি ও তার মিত্র ওসামা বিন লাদেনের সম্পর্কে কিছু টানাপোড়েন জন্ম হয়। ব্যক্তিগত সকল সম্পদ দলের জন্য ব্যয় করার বিষয়টি বিন লাদেন মেনে নেননি। সেই দলের একজন বিশ্বস্ত সদস্য, যে কিনা দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির সাথে জড়িত ছিল, সে আমাকে বলেছে যে, জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে উদ্দেশ্য করে *কালিমাতু হাক্ব* (সত্য বাণী) বুলেটিনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। সেখানে সে বলেছিল, “কম বয়সীরা নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছে যেখানে ধনকুবেররা সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করছে।”

আহমেদ আল-নাগার আমাকে ইয়েমেনে এবং সুদানে থাকাকালীন ইসলামি জিহাদের সদস্যদের করুণ কাহিনী শুনিয়েছিল। সেসময় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও তাদের কাছে ছিল না। ওসামা বিন লাদেন তালিবানের সাথে একটি চুক্তি করার আগ পর্যন্ত দলের সদস্যরা কাজের খোঁজ করছিল। সেই চুক্তি লাদেনকে ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের আফগানিস্তানে আনার এবং তাদের পরিবারকে মাসিক ১০০ ডলার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

৪. জাওয়াহিরির দর্শনে পরিবর্তন আসার আরেকটি কারণ হলো নেতৃস্থানীয় অনেক সদস্যের মিশরের বাইরে আটক হওয়া। যেমন—আহমেদ ইব্রাহিম আল-নাগার, শাওকি সালামা মোস্তফা এবং মোহাম্মদ হাসান আলবেনিয়ায় আটক হয়েছিল, এসাম আবদেল তাওয়াব আটক হয়েছিল বুলগেরিয়ায়। মিশরের ভেতরে প্রায় শতাধিক সদস্য মিশরীয় পুলিশের কাছে গ্রেফতার হয়। পরে আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসে মিলিটারি কোর্টে ১০৮ সদস্যের বিচার করা হয়।

৫. আহমেদ সালামা মুবারাকের আটক হওয়া জাওয়াহিরি এবং তার দলের জন্য অনেক বড় একটি ধাক্কা ছিল। আহমেদ সালামা ছিল জাওয়াহিরির বিশিষ্ট সহকারী। মুবারক গ্রেফতার হয়েছিল আজারবাইজানে। তার সাথে মোহাম্মদ সাঈদ আল-আশরি—যে কিনা আবু খালিদ নামেও পরিচিত—সে এবং কানাডার নাগরিকত্ব থাকা এসাম মোহাম্মদ হাফেজও আটক হয়েছিল। তারা সকলে মিশরে ধরা পরে। পুলিশ মুবারকের একটি কম্পিউটারও জব্দ করে, যেখানে পুরো পৃথিবীতে থাকা দলের সব সদস্যের নাম ছিল। সেই কম্পিউটার দলের সদস্যদের অবস্থান, নতুন সদস্য—যাদের কথা মিশরীয় কর্তৃপক্ষ জানে না, এমনকি আল-কায়েদার বেশ কিছু সদস্যের তথ্যও প্রশাসনের কাছে প্রকাশ করে। সেই কম্পিউটারে মিশরের বাইরের এমন কিছু সদস্যের নামও ছিল, যাদেরকে জাওয়াহিরি দলে ঢুকিয়েছে। যেমন—মোহাম্মদ আতেফ, যে আবু হাফস নামেও পরিচিত। আতেফের আসল নাম ছিল সবহি আবদেল আযীয আবু সেনা। যে ২০০১ সালের নভেম্বরে কাবুলে আমেরিকার হামলায় মারা যায়। মিলিটারি কোর্ট দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। একজন তথ্যদাতা আমাকে জানিয়েছিল যে, মুবারক দলের কিছু নীতিমালার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে এবং আজারবাইজানে গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত সে জাওয়াহিরির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এটা দেখা দরকার, আহমেদ আল-নাগার এ বিষয়ে কী বলে। কারণ, সেসময় সে এসবের সাথে যুক্ত ছিল। আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসে সে স্বীকারোক্তিতে বলেছে—

যখন আমি মিশর ত্যাগ করলাম, আমি লক্ষ্য করলাম দলটি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ১৯৯২ সালে মিশরে বিভিন্ন কার্যক্রম চালাতে গিয়ে এটি ভয়াবহ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা গ্রেফতার হতে থাকে। এর ফলে দল ভীষণ আর্থিক এবং সামগ্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু তখনও দলে থাকা সদস্যরা দল পরিচালনা করার জন্য এবং মিশরে অপারেশন শক্তিশালী হামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। আর্থিক পুঁজি কমতে শুরু করেছিল। আতেফ সিদকির কেসে বিশাল সংখ্যক সদস্য আটক হওয়া এর অন্যতম কারণ। দলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের অবহেলার কারণে এমনটা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে জাওয়াহিরি ইসলামাবাদে মিশরীয় দূতাবাসে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। একই দিনে খান আল-খালিলে হামলা চালানোরও সিদ্ধান্ত নেয়। সে ভাবছিল, এই দুই অপারেশন বাস্তবায়নের পর মিলিটারি অপারেশন চালানো থেকে বিরতি নিয়ে দলের পুনর্গঠনে মন দেবে।

৬. অভ্যন্তরীণ বিভক্তি আরও একটি বড় কারণ ছিল। আমি আগেই বলেছি, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে জাওয়াহিরি জিহাদি মানসিকতার সদস্যদের একত্র করে ইসলামিক জিহাদের ছত্রছায়ায় আনতে সক্ষম হয়। কয়েকজন সদস্যের দল ছেড়ে যাওয়ায় দলটিকে আরও দুর্বল করে দেয়। একারণে জাওয়াহিরি অবশেষে মিশরে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো বন্ধ করে ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। জাওয়াহিরির সাথে মতবিরোধ করা অন্যতম সদস্য হলেন আহমেদ

হুসাইন ওগায়যা। ওগায়যা বেনি সুয়েফ[৭১] দলের পুরাতন সদস্য ছিলেন। ওগায়যা দলের অন্যতম বুদ্ধিজীবি এবং নীতিনির্ধারক ছিল। সে ১৯৯৩ সালে আফগানিস্তানে থাকাকালীন জাওয়াহিরির সাথে মতবিরোধের কারণে দল ছেড়ে চলে আসে। সে দলের অন্যান্য সদস্য যেমন ঈসাম আবদেল তাওয়াবকে দল ছেড়ে আসতে প্রলুব্ধ করে। ওগায়যার সাথে এই মতবিরোধ *তালে আল-ফাতেহ* গঠনের দিকে নিয়ে যায়। এই সঙ্কট দলটিকে দুর্বল বানিয়ে দেয়। এটা যারা জাওয়াহিরিকে ছেড়ে এসেছে, তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার অন্যতম কারণ।

আমি সেসময় দাবি করেছিলাম, *তালে আল-ফাতেহ* কোনো আলাদা দল নয়, বরং *তালে আল-ফাতেহ* জাওয়াহিরির নেতৃত্বাধীন দলেরই আরেক নাম। *তালে আল-ফাতেহ* কেসে অভিযুক্তরা যখন মিলিটারি কোর্টে সাজাপ্রাপ্ত অবস্থায় জেলের ভেতর থেকে জাওয়াহিরির প্রতি আনুগত্য নিয়ে কথা বলছিল, তখনই বিষয়টা স্পষ্ট হয়।

দলটির দুর্বল হয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হলো, বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ডা. সাইয়িদ ইমাম আব্দেল আযীযের (যে ফাদল নামেও পরিচিত) দল ভেঙে চলে যাওয়া। আবদেল আযীয পূর্বে বিভিন্ন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দলের সাথে ছিলেন। *The Basis for Preparedness* বইটি আবদেল আযীযেরই লেখা, যেটি দলের সংবিধান, ভিত্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আইন বিষয়ক সংবিধান হিসেবে ছিল। তার দলত্যাগের পরও কোনো সদস্য শরিয়াহ নিয়ে আবদেল আযীযের পর্যায়ে কাজ করেনি।

৭. ওসামা বিন লাদেনও জাওয়াহিরির পন্থায় পরিবর্তন আসার গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জাওয়াহিরি ওসামা বিন লাদেনের মতবাদে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, ১৯৮৬ সালে যখন থেকে তাদের প্রথম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। জাওয়াহিরি তার জিহাদি পন্থায় বিন লাদেনকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, তাকে মৌলবাদী বক্তায় পরিণত করতে পেরেছিল। ওসামার

---

৭১. ইসলামি দল বা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

মূল উদ্দেশ্য ছিল দাতা সংস্থার হয়ে জিহাদি যোদ্ধাদের সাহায্য করা, জাওয়াহিরি আরব বিশ্বে স্বৈরাচারী এবং আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার মনোভাব গড়ে তোলে। জাওয়াহিরি তার বিশ্বস্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ওসামার কাজে সাহায্য করতে পাঠায়। তারা পরবর্তীতে বিন লাদেনের দল আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গে পরিণত হয়। এই ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন আলি আল-রাশেদী—১৯৮১ সালে সাদাত হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে বরখাস্ত হওয়া পুলিশ অফিসার। আলি আল-রাশেদি, আফগানিস্তানে আবু ওবায়েদ আল-বানশীরি নামে পরিচিত ছিল। বিন লাদেনকে সাহায্যকারী জাওয়াহিরির আরেকজন সহযোগী হলো সাবহি আবদেল আযীয আবু সেনা, যে আবু হাফস এবং মোহাম্মদ আতেফ নামে পরিচিত। সাবহি বেহিরা বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার ধর্মীয় ঝোঁকের কারণে সেনাবাহিনী থেকে বহিস্কৃত হয়। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধের প্রথম দিকে সে মিশর ছেড়ে জিহাদ করার জন্য আফগানিস্তানে যায়। আল-বানশীরি এবং আবু হাফস আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে কোনো ইসলামিক দলের সাথে জড়িত ছিল না। কিন্তু জাওয়াহিরি তাদের নিজের দলে ভেড়াতে সফল হয়। অনেকে মনে করে, ওসামা বিন লাদেন আরব মুজাহিদদের নেতা আবদুল্লাহ আযযামের প্রভাবে জিহাদি পন্থার দিকে অগ্রসর হয়। অথচ এটা একটা ভুল ধারণা। আযযাম ওসামা বিন লাদেনের আর্থিক সাহায্য সোভিয়েত যুদ্ধের মুজাহিদদের রিলিফের কাজে ব্যয় করে। ওসামা বিন লাদেনের ওপর আযযামের প্রভাব আফগান যুদ্ধের ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। আযযাম সেসব আরব শাসকদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আগ্রহী ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করছিল। জাওয়াহিরি শুধু বিন লাদেনকে প্রভাবিতই করেনি, পরবর্তীতে জাওয়াহিরির মতবাদ এবং তাকে ইসলামিক জিহাদের দিকেও নিয়ে এসেছে। যেমন বিন লাদেন জাওয়াহিরিকে মিশরে সশস্ত্র অপারেশন করা বাদ দিয়ে তার সাথে যুক্ত হয়ে সর্বজনীন শত্রু আমেরিকা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে। তার পরামর্শে জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে ফিরে আসে, যখন

ওসামা তালিবানের সাথে চুক্তি করে জাওয়াহিরি এবং ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সেসময় আফগানের ৯৫% অঞ্চল তালিবানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আহমেদ আল-নাগার আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসে বলে, “তালিবান আন্দোলনের সাথে চুক্তির ফলে আরব আফগান মুজাহিদদের দায়িত্ব সরাসরি ওসামা বিন লাদেনের ওপর এসে যায়।”

ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদি ফ্রন্টগুলোর নেতৃত্ব ওসামা বিন লাদেনের ওপর থাকা স্বাভাবিক ছিল। ফিলিস্তিন এবং আরব উপদ্বীপে আমেরিকার উপস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দিয়ে আরব এবং মুসলিমদের হৃদয় নাড়া দেওয়ায় সে ছিল বিখ্যাত। সে বলে, ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আমেরিকা মুসলিমদের অবস্থানকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তার ফ্রন্টের মিশন ছিল আরব এবং মুসলিম দেশগুলো থেকে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিহত করা। জাওয়াহিরি বিন লাদেনের ফ্রন্টের প্রস্তাব মেনে নেয়, যেই ফ্রন্ট ১৯৯৮ সালে গঠিত হয়েছিল। তার সম্মতির কারণ ছিল ইসলামিক জিহাদ দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং অর্থনৈতিক পুঁজির অভাব। ওসামা বিন লাদেন ফ্রন্টের নেতা হলেও জাওয়াহিরি ছিল স্থপতি এবং মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ দলের অন্যান্য সদস্য, যেমন—আবু হাফস, সাঈফ আল-আদল, নাসর ফাহমি—যে মোহাম্মদ সালাহ নামেও পরিচিত, তারেক আনোয়ার সাইয়েদ আহমেদ, সারওয়াত সালাহ শেহাতা ছিল দলের ভিত্তি। ওসামা বিন লাদেনের সাথে মিত্রতা জাওয়াহিরির মতাদর্শে পরিবর্তন আনে। নিকট শত্রুর সাথে সংঘাতের থেকে সেটা আমেরিকা এবং ইসরায়েলের মতো দূরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়। এই ক্রমবিকাশ ইসলামিক জিহাদ দলের কিছু সদস্যদের ডামাডোলে ফেলে দেয়। প্রথম দিকে অনেকেই অসম্মতি জানায়। কিন্তু পরবর্তীতে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুবিধার কথা ভেবে তারা ফ্রন্টে যুক্ত হতে সম্মত হয়। নাগার বলে, যারা ইউরোপীয় দেশগুলোতে আশ্রয় চাচ্ছিল, তারা ছাড়া কেউই এই ফ্রন্টে যুক্ত হতে নাকচ করেনি। কেউ ফ্রন্টে যুক্ত হতে না চাইলে সে শুধু নিজেকে একা পেত এবং কেবল নিজের পুঁজিটুকুকেই সম্বল হিসেবে দেখতে পেত।

৮. জাওয়াহিরিকে জামাআ আল-ইসলামিয়া থেকে মিশর এবং মিশরের বাইরে কোনোপ্রকার অপারেশন না করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সে অস্ত্রহীন ইসলামিক কার্যক্রমের বিরোধিতা করে ঘন ঘন মুসলিম ব্রাদারহুডের বিষয়ে মন্তব্য করে। এই বিরোধিতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে তার *আল-হাসাদ আল-মুর (তিক্ত ফসল)*—যেটা মুসলিম ব্রাদারহুডের অসামরিক পন্থার সমালোচনা করে লেখা হয়েছে—রচিত হয়।

১৯৯৬ সালে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতা খালেদ ইব্রাহিম আসওয়ানে এক বছর সকল সামরিক অপারেশন বন্ধের আহ্বান জানায়, যেটার ব্যাপারে আমি সমর্থন জানিয়েছিলাম। অপরদিকে জাওয়াহিরি ইব্রাহিমের আহ্বানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সামরিক অপারেশন বন্ধ না করতে চেয়ে বক্তব্য প্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রিয় কর্মীরা যখন যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নেয়, তখন জাওয়াহিরি মুশকিলে পড়ে যায়। ১৯৯৩ সালে সে তার গ্রুপকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার সাথে শুধু মিশরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর আদেশ দিয়েছিল। জামাআ আল-ইসলামিয়াও তখন একই রকম অপারেশন চালাচ্ছিল, আর তরুণদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়তাও পাচ্ছিল। জাওয়াহিরি জামাআ আল-ইসলামিয়ার এই জনপ্রিয়তার ভাগিদার হয়ে তা উপভোগ করতে চাচ্ছিল। যেহেতু জামাআ আল-ইসলামিয়ার সদস্য সংখ্যা তখন বেড়েই চলছিল, আর এটাই মিশরীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল, এমন সময় এই দলের প্রধানদের অপারেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত অনেকের জন্য অস্ত্রবিরতির নিয়ম ভঙ্গ করাকে কঠিন করে দেয়। সেসময় জাওয়াহিরিও ইসলামিক জিহাদ মিশরের বিভিন্ন অপারেশন বন্ধ করার কথা ভাবছিল, কিন্তু তার সিদ্ধান্তের কারণ জামাআ আল-ইসলামিয়ার চেয়ে ভিন্ন ছিল। জামাআ আল-ইসলামিয়ার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে প্রধান কারণ ছিল ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের অতিরিক্ত আগ্রহ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া। অন্যদিকে পূর্বে আলোচিত দলের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বেড়ে

যাওয়া ছিল জাওয়াহিরির সিদ্ধান্তের কারণ। ইসলামিক জিহাদের মতো জামাআ আল-ইসলামিয়া দলের অভ্যন্তরীণ বিভক্তির সম্মুখীন হয়নি। প্রচারক ও নেতা-কর্মীর সংখ্যার দিক দিয়েও এটা অনেক বড় ছিল। জাওয়াহিরি তখন গোপনে অপারেশন বন্ধ করার কথা ভাবছিল, যখন অপারেশনগুলো জামাআ আল-ইসলামিয়ার গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে কারণগুলো গোপন করে। সে লোকদের জানান দিতে চাচ্ছিল না যে ইসলামিক জিহাদের দুর্বলতাই একে অপারেশন বন্ধ করতে বাধ্য করছে। জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ সব জিহাদি দলগুলোর মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে, এমনকি জাওয়াহিরির ঘনিষ্ঠ লোকদের মাঝেও। উপরন্তু অনুগত্যের বাইরে গিয়ে এই উদ্যোগের সমালোচনা করে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার উপায়ও তাদের ছিল না। জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতির চাপে পড়ে জাওয়াহিরি ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদে যোগ দেয়। এটা তার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ভালো একটি মাধ্যম ছিল। পাশাপাশি ইসলামিক জিহাদ দলকে পুনর্গঠন এবং সংগঠিত করার জন্য সুবর্ণ সুযোগও তার হাতে ছিল।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে এক নতুন জাওয়াহিরির আবির্ভাব হয়—ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রতি আরও বেশি আগ্রহী, মুসলিমদের ইসরায়েল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোয় উৎসাহ প্রদানকারী।

ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং আমেরিকার সাথে শত্রুতার যেই নতুন মতবাদ জাওয়াহিরি গ্রহণ করে, সেটার সাথে তার নিকট শত্রু, যেমন-মিশর এবং দূরবর্তী শত্রুর মতবাদের অর্থাৎ প্রথমে মিশর সরকারের সাথে যুদ্ধের মতবাদের সাথে কোনো সংযোগ দেখা যায় না। অন্যদিকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত ছিল দলটির প্রকৃত শান্তিপূর্ণ দর্শনের বহিঃপ্রকাশ, যেই মতবাদ ১৯৭০ এর দশকে দলটির মধ্যে শুরুর দিকে ছিল। নাইরোবি এবং দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে হামলা পরিচালনার জন্য জাওয়াহিরি দলের সদস্যদের মাঝে

কিছু রদবদল করে। সে চাচ্ছিল—লোকে জানুক যে এই অপারেশনের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য সে ১৯৯৪ সালের ৪ অগাস্ট একটা বক্তব্য প্রকাশ করে—

> *মিশরীয় ইসলামিক জিহাদ থেকে বিবৃতি দিচ্ছি আমাদের কয়েকজন ভাই সম্পর্কে, যারা এখন পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলোতে বন্দী রয়েছেন। প্রথম ভাইয়ের নাম তারিক, তিনি পশ্চিম ইউরোপে আটক হয়েছেন, যারা মুসলিমদের ঘৃণাকারী হিসেবে পরিচিত। তার সাথে তার আলবেনিয়ান স্ত্রীও ছিল। অপারেশনটি সংঘটিত হওয়ার দুমাস পর আবু ইসলাম এবং আবু মাহমুদ ভাই সহ আরও দুজন ভাই আলবেনিয়ায় আটক হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তারা এমন দলের সাথে যুক্ত যারা আমেরিকা, ইসরায়েল এবং তাদের দালালদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। সেই সাথে আমেরিকার কর্তৃত্ব রুখে দিতে কসোভোর মুজাহিদদের সাহায্য করেছে। আমরা আমেরিকানদের বলতে চাই যে তাদের বার্তা পৌঁছে গেছে এবং জবাবও প্রস্তুত হচ্ছে। আমেরিকানদের এটা ভালো করে পড়া উচিত, কেননা আমরা এমন ভাষায় লিখব ইনশাআল্লাহ যে ভাষা তারা বুঝতে পারে।*

নাইরোবি এবং দারুস সালামের দুই দূতাবাসে বোমা হামলার কয়েক ঘন্টা পূর্বে জাওয়াহিরি এই বক্তব্য প্রকাশ করে। জাওয়াহিরি এই অপারেশনে তার অংশগ্রহণের কথা পৃথিবীকে জানান দিতে চাচ্ছিল শুধু বক্তব্যে উল্লেখ করা কারণগুলোর জন্যই নয়; পাশাপাশি আরব এবং মুসলিম জনগণের কাছে আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত পাওয়ার জন্যও। মিশরীয় অপারেশনগুলোর ব্যর্থতার পর তার জনসমর্থনের প্রয়োজন ছিল। মিশরীয় অপারেশনগুলোতে সে ইহুদি এবং আমেরিকানদের টার্গেট বানায়নি, কিন্তু ভুলবশত সেখানে সাইয়িদ ইয়াহিয়া আর শায়মার মতো বেসামরিক শিশু নিহত হয়। Islamic Army of the Holy Places নামের একটি দল, যেটা আন্তর্জাতিক জিহাদি ফ্রন্টের সাথে যুক্ত ছিল, তারাও একটি বক্তব্য প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেখানে জাওয়াহিরির উল্লেখিত কারণগুলোর কথা বলা হয়নি।

জামাআ আল-ইসলামিয়ার অস্ত্রবিরতি উদ্যোগ

জামাআ আল-ইসলামিয়ার অস্ত্রবিরতি উদ্যোগে দলটির ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ বা যারা বর্তমানে সাদাত হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কারাভোগ করছেন, তাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এটার পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যাদের ইসলামিস্টদের ওপর আস্থা নেই, তারা এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

সবচেয়ে সক্রিয় সমালোচক ছিল জাওয়াহিরি। ইসলামিস্ট দলগুলোর মাঝে একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল যে দলের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এই উদ্যোগের সমালোচনা করে জাওয়াহিরি কেবল সেই নিয়ম ভঙ্গই করেনি বরং এর সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। পরবর্তীতে সে লোকদেরকে এর বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে। এমনকি জামাআ আল-ইসলামিয়ার যেসব সদস্য এই উদ্যোগের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিল, তাদেরকে অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। জামাআ আল-ইসলামিয়া দলের শুরা কাউন্সিলের প্রধান রাফে আহমেদ তাহা এই উদ্যোগের অন্যতম বিরোধী ছিল। জাওয়াহিরি তার এবং ওসামা বিন লাদেনের পর তাহাকে জনসম্মুখে এসে এর বিরোধিতা করতে উৎসাহ দিচ্ছিল। সে পশ্চিমা এবং আমেরিকান মিডিয়ায় এই বলে বার্তা পাঠানোর আশা করছিল যে তাহা ওসামা বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরির ইসরায়েল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে পাশে আছে। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্যোগের সাথে দ্বিমত থাকলেও তাহা এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার কারাবন্দী বা প্রবাসী নেতাদের কেউই আমেরিকা এবং তার মিত্রদের টার্গেট বানানোর প্রতি আগ্রহী ছিল না। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, ১৯৯৩ সালে যখন কিছু আলেম এবং ইসলামিক এক্টিভিস্ট ইসলামিক দলগুলো এবং সরকারকে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল, তখন জাওয়াহিরি কোনো মন্তব্য করেনি।

বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উদ্যোগে আমার ভূমিকা আমি কখনও গোপন করিনি এবং জাওয়াহিরি আর তার সহযোগীদের কাছে সব ইসলামিক ঘটনায় প্রকাশিত দস্তাবেজও সংরক্ষিত আছে। ১৯৯৩ সালে আরেকটি শান্তিপূর্ণ উদ্যোগের পক্ষে আমি লিখেছিলাম, যেটার কারণে মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দেল হালীম মুসা বরখাস্ত হয়। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে খালেদ ইব্রাহিমের আহ্বানকেও আমি সমর্থন জানিয়েছি। ১৯৯৭ সালের ৫ জুলাই জামাআ আল-ইসলামিয়ার উদ্যোগকে সমর্থন জানানোর সাথে পূর্বের কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন জানানোর মাঝে পার্থক্য আছে।

এটা শুরু হয়েছিল মোহাম্মদ আল-আমীন আব্দেল আলীমের জামাআ আল-ইসলামিয়ার ঐতিহাসিক নেতাদের বিবৃতি পড়ার মাধ্যমে। এটা ঘটেছিল মিলিটারি কোর্টে এবং শেষ হয়েছিল ১৯৯৯ সালের মার্চে শুরা কাউন্সিলের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত—মিশরের ভেতরে-বাইরে সবরকমের অপারেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রকাশের মাধ্যমে। এ বিষয়ে আমি ঠিক করলাম যে জামাআ আল-ইসলামিয়ার কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে শান্তিপূর্ণ আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। দলটির বেশিরভাগ নেতার অবর্তমানে আমার সাময়িক ভূমিকাটি প্রয়োজনীয় ছিল। ২০০১ সালের শুরু দিকে দলটির অন্যতম সদস্য হামদি আব্দেল রাহমান শান্তিপূর্ণ অবস্থার আহ্বান করলে আমার মনে হলো এবার সে ভার নিতে পারে।

অস্ত্রবিরতির প্রস্তুতি নিয়ে জাওয়াহিরির সাথে আমি প্রথম আমার কার্যক্রম আলোচনা করি ১৯৯৭ সালে লন্ডন যাত্রার সময়। বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে ইসলামে মানবাধিকার নিয়ে লেকচার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম সেবার। Maqreezy Center for Historical Studies এর প্রধান আদিল আব্দেল মাজীদ (আমেরিকা যাকে ওসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্ক থাকার জন্য গ্রেফতার করার চেষ্টায় আছে) আমাকে বিমানবন্দরে নিতে এসেছিল। হানি আল-সিবাই এবং ইসলামিক কুরআন অ্যান্ড সুন্নাহ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান শাইখ মুহাম্মদ আল-মোকরেইও মাজীদের সাথে এসেছিল। আব্দেল মাজীদ এবং সিবাই

দুজনেই কায়রো শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি লিগ্যাল সার্ভিস অফিসে আমার সাথে কাজ করত। মোকরেই জামাআ আল-ইসলামিয়ার একজন বিখ্যাত প্রচারক। তারা সবাই আমার আতিথিয়েতা করতে উঠে-পড়ে লাগে। আব্দেল মাজীদের বাসায় পৌঁছাতেই জাওয়াহিরি আমাকে কল করল। লন্ডনে ভালোভাবে পৌঁছার জন্য আমাকে অভিবাদন জানিয়েই সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন তোমার ভাইদের রাগাচ্ছ?" ১৯৯৬ সালের খালেদ ইব্রাহিমের যুদ্ধবিরতি আহ্বান প্রচার করার জন্য সে শান্তভাবে আমার নিন্দা করতে লাগল। সে বলল, আমার কাজ অনেক ভাইকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

অনেক সময় ধরে আমি জাওয়াহিরির সাথে মুঠোফোনে আলোচনা করেছিলাম, কেন আমি মিশরে বিভিন্ন সশস্ত্র অপারেশন বন্ধের এই উদ্যোগকে সমর্থন দিচ্ছি। জাওয়াহিরিকে একের পর এক যে কারণগুলো আমি বলেছিলাম, সেগুলো আমার প্রেসের কাছে বলা কারণের চেয়ে কিছুটা আলাদা। আমি রক্তক্ষয় বন্ধের জন্য বিতর্ক করে যাচ্ছিলাম আর দুর্বল অবকাঠামোর অজুহাতে ইসলামিক শরিয়াহ অনুযায়ীও এই যুদ্ধবিরতি গ্রহণযোগ্য। আমি আরও বললাম, অনেক তরুণ, যারা কোনো অপরাধের সাথে জড়িত নয়, তারাও কারাবন্দী হয়ে পড়ছে। নিয়মিত ধরপাকড়ের কারণে স্বজনদের হারিয়ে হাজারও পরিবার দারিদ্রে পতিত হচ্ছে। বিভিন্ন রকম সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

জাওয়াহিরি বলল, এই কাজে সমর্থনের মাধ্যমে আমি মুজাহিদদের দুর্দশায় ফেলছি। আমি তাকে বললাম, শান্তিপূর্ণ দাওয়াহ আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। আর শান্তিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে একটি শান্তিপূর্ণ কৌশল অপরিহার্য। আমি ইসলামের পথে অন্যদের ডাকব, সত্য বলব কারও পরোয়া বা করে, কাউকে ভয় না পেয়ে। আমার পরিণতি যেমনই হোক না কেন। এমনকি নির্যাতনের শিকার হতে হলেও আমি একই কথা বলব। আমি আরও বললাম, জিহাদ শুধু সশস্ত্র পন্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

না জাওয়াহিরি আমার যুক্তিতে আস্বস্ত হতে পারছিল, আর না আমি তার যুক্তিতে। যাহোক, আমরা শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ে একমত হলাম

যে, আমাদের উভয়েরই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা দেখা এবং বুঝা উচিত। আর আমরা দুজনই ভালো মুসলিম, যারা নিজেদের ইসলামিক নীতিমালার সাথে আপস করতে চাই না। ফোনালাপে জাওয়াহিরি আমাকে লন্ডনে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এবং আমার পরিবারকে সেখানে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিল। সে কথা দিয়েছিল, আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে আমাকে একটি স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। সে ভেবেছিল, আমার লন্ডনে অবস্থান ইসলামিক জিহাদের জন্য উপকারী হবে। আমি বিনয়ের সাথে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে কায়রো ফিরে এলাম।

এটা ছিল আমার জামাআ আল-ইসলামিয়ার সেই উদ্যোগ ঘোষণা করার কয়েক মাস পরের কথা। জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিশিষ্ট নেতারা আমাকে এই উদ্যোগ প্রচার করার এবং মিশরের ভেতরে বা বাইরে অবস্থানরত তাদের ভাইদের কাছে সত্য বলে প্রমাণ করার দায়িত্ব দিতে চায়। আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম, যদিও আমি তখন সেই দলের সদস্য ছিলাম না এবং এখনও নেই। আমি এই উদ্যোগের কথা সেভাবেই প্রচার করছিলাম যেভাবে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃবৃন্দ আমাকে বলেছিল, ইসলামিক জিহাদ বা এই দলের নেতা জাওয়াহিরির বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে। তোরা কারাগার থেকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার বন্দী নেতারা আমাকে একটি কাগজ দিয়েছিল। তাদের কারও হাতে লেখা ছিল সেটি। সেখানে তারা আমাকে জানিয়েছিল, আমাদের মাঝে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেলে আমি কী কী বিষয় প্রচার করতে পারব বা ঘোষণা দিতে পারব।

কাগজটিতে অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি আরও যে নির্দেশগুলো ছিল সেগুলো হলো—

১. এ বিষয়ের আশ্বাস দিতে হবে যে দাওয়াহর কাজ এবং মসজিদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র অপারেশন শুরু হবে না।

২. সরকার কোনো ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসের জন্য শাস্তি দেবে না।

৩. খ্রিস্টানদের বিষয়ে বলতে গেলে দুটো বিষয় রয়েছে, প্রথমত, চার্চ অবাধে তাদের মতবাদ প্রচার করতে পারবে। কোনো মুসলিম যদি চার্চে গিয়ে খুতবা দিতে চায় বা দাওয়াহ দিতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, জামাআ আল-ইসলামিয়া খ্রিস্টানদের শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হত্যা করে না, যদি না অন্য কোনো কারণ থাকে।

আমাকে প্রেরিত কাগজে ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল রেখে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতারা আমাকে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেছিল, যেগুলো তাদের দলে ভূমিকা রাখতে পারবে—

১. ইসলামিক গ্রুপগুলোর রাজনৈতিক এবং দাওয়াহর পথ থাকতে হবে, যাতে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা যায় এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি ও তাদের ধ্বংসাত্মক মতবাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়।

২. মিশরীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল অধিকার এবং স্বাধীনতা ইসলামিক দলগুলোকে দিতে হবে, যাতে সশস্ত্র কার্যক্রমগুলোকে বাদ দেওয়া যায়।

ইসলামিক জিহাদেরও কিছু সদস্য চাচ্ছিল আমি তাদের জন্যও সেভাবে কাজ করি, যেভাবে জামাআ আল-ইসলামিয়ার উদ্যোগের কথা প্রচার করছিলাম। যেমন—নাবীল আল-মাগরিবি এবং আহমেদ ইউসুফ হামদুল্লাহ অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দিয়েছিল। আমি তাদের বক্তব্য বা বার্তা প্রচার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলাম। কারণ, আমি জানতাম এমনটা করলে জাওয়াহিরি একঘরে হয়ে পড়বে। একই ভাবে আমি জাওয়াহিরির সঙ্গ ত্যাগ করা ইসলামিক জিহাদের আরেক নেতা ওসামা সাদিক আইয়ুবের বক্তব্যও প্রচার করা থেকে বিরত থাকি। সে ইসলামিক জিহাদের অনুগত ছিল এবং অবশেষে জাওয়াহিরির দলে ফিরেও এসেছিল। আইয়ুব জার্মানি থেকে অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব করেছিল এবং সে জার্মানিতে আশ্রয় চাচ্ছিল। শারিকিয়াহর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইসলামিক জিহাদ দলের আরেক কারাবন্দী নেতা হাশিম আবাযাও আমাকে একই অনুরোধ করেছিল।

সে চাচ্ছিল আমি কিছু বিষয় নিয়ে 'হাজ্জ'[৭২] এর সাথে, মানে জাওয়াহিরির সাথে যোগাযোগ করি। সরকারের সাথে মিটমাট করার জন্য কিছু বিষয়ে সে সমর্থন করেছিল, এগুলোর ওপর ভিত্তি করে—

- শান্তিপূর্ণ দাওয়াহর পথ অবলম্বন করে প্রশাসনের সাথে সংঘাত এড়িয়ে যেতে হবে।
- খ্রিষ্টানদের সাথে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এটাও শেখাতে হবে যে তারা আমাদেরই অংশ এবং তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না।
- এই মিটমাটের কথা মাথায় রেখে আটক হওয়া সদস্যদের আত্মীয়দের দাবি মেনে নিতে হবে।

সে আরও লিখেছিল, এই উদ্যোগ 'সেই লোকটিকে ছাড়া', মানে জাওয়াহিরিকে ছাড়া ব্যর্থ হবে। আমি তার সাথে একমত ছিলাম। আমি আবাযাকে অপেক্ষা করতে বললাম। কারণ, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু সে তারপরও জাওয়াহিরির সমর্থন ছাড়া এগিয়েছিল। মিলিটারি কোর্টে আলবেনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কেসের বিচার চলাকালীন সে নিজেই উক্ত পদক্ষেপের বিষয়ে বিবৃতি দেয়। শেষপর্যন্ত কেউই তার বক্তব্যে নজর দেয়নি। কারণ, সেটা ভালোভাবে প্রস্তুত করা ছিল না।

এমনকি আবাযার এই পদক্ষেপের আগে জিয়া গ্রুপের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ নাসর আদদীন আল-গাজলানি ১৯৯৮ সালে খান আল-খালিল কেসে বিচার চলাকালীন চাইছিল আমি তার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

আমি তাকে বলেছিলাম, তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থাকা স্বত্বেও এবং তার দলের প্রতি সমর্থন থাকা স্বত্বেও আমি তার কথা প্রচার করতে পারব না। গাজলানির দলকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার সাথে যুক্ত বলেই মনে করা হতো।

---

৭২. মানে যে আবশ্যকীয় তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করেছে। মিশরে 'হাজ' শব্দটি সাধারণ বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানীয় কাউকে বুঝার ব্যবহৃত হয়।

আমার এই দর্শনের কারণ ছিল, ইসলামিক জিহাদ দলের নেতা জাওয়াহিরি এই শান্তিপূর্ণ পন্থার সমর্থন করে না। গাজলানির প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে তার দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়ে যায়।

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, যখন খান আল-খলিল কেসের কোনো এক সেশনে মিলিটারি কোর্টে গাজলানি এই কথাগুলো পড়ছিল—

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালের সেশনে এই সম্মানিত কোর্টে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুনতাসির আল-যায়াত যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তার সাথে আমি সম্পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করি। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, দেশে সরকার এবং কিছু লোকের মাঝে যে আত্মবিরোধের আগুন জ্বলছে, সেটি দমন করতে তিনি এবং তার সাথে কর্মরত আন্তরিক দলটি যেন সফল হন। এই আগুন জ্বালাতে সাহায্য করেছে দেশের শত্রুরা। মুসলিম এবং আরবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তিন শত্রুর মধ্যে আন্তর্জাতিক জায়ানিজম মিশরের এই অন্তবিরোধের পেছনে দায়ি। যেই ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো ঘটছে, এর পেছনে ভয়ঙ্কর জায়ানিস্টদের হাত রয়েছে। এই হাতগুলো দেশের অশান্তির আগুনে ঘি ঢালছে।

গাজলানি কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য বলে—

মাননীয় বিচারপতি মিশরের সাথে ইহুদিদের আনুষ্ঠানিক শান্তিচুক্তি থাকলেও তাদের শত্রুতা মরে যায়নি। ইহুদিরা তরুণদের টার্গেট করে মিশরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে চায়। কারণ, তরুণরাই যেকোনো দেশের শক্তি, সভ্যতা-অগ্রগতির মূল।

এরপর গাজলানি তিনটি সশস্ত্র অপারেশনের কথা উল্লেখ করে, যেখানে সে পরিষ্কারভাবে ইহুদিদের হাত দেখতে পায়।

প্রথমটি হচ্ছে, ওয়াদি আল-নীল কফিশপে বোমা হামলা। হারাম ট্যানেলে বিস্ফোরণ এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ওমার আব্দেল আযীয হত্যা চেষ্টা।

সে আরও বলে, আব্দেল আযীয তার হত্যা চেষ্টার অনুসন্ধানে ইহুদিদের অভিযুক্ত করেছেন। তার ভাষ্যমতে, ইহুদিরা মিশরীয় তরুণদের উসকে দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চায়।

সে বলে—ইহুদিরা মিশরে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে উপকৃত হবে। কারণ, অন্তঃকলহের ফলে মিশরীয় প্রশাসন অভ্যন্তরীণ বিষয়ের দিকেই বেশি মনোযোগ দেবে। ফলে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এবং ফন্দির দিকে নজর দিতে পারবে না। ইহুদিরা মিশরে পর্যটকদের সাথে ঘটা দুর্ঘটনাকেও অতিরঞ্জিত করে করে প্রকাশ করে, যাতে পৃথিবীর কাছে মিশরকে অনিরাপদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এতে করে মিশর মিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং মিশরের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে তারা এমন একটি বাজার তৈরি করতে চায়, যেই বাজার শুধু ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করবে। সে বলতে থাকে—

মহামান্য বিচারপতি, আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে চাই যে মুনতাসির আল-যায়াত এবং প্রিয় মিশরের কয়েকজন লোকের গৃহীত প্রয়াস সফল হবে। আশা করছি, তাদের এই চেষ্টা আরবদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং আরব এবং মুসলিম জাতিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকা ভয়াবহ বিপদ-আপদের মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করবে।

গাজলানিকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

উপরের আলোচনা ইসলামিক জিহাদের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অল্প কয়েকটি বার্তার নমুনামাত্র। অথচ জাওয়াহিরি দাবি করে, তার দলের কেউ অস্ত্রবিরতি উদ্যোগের সাথে জড়িত ছিল না। যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত, তারা সবাই জামাআ আল-ইসলামিয়া দলের সদস্য এবং তাদের বাধ্য করা হয়েছে। জামাআ আল-ইসলামিয়ার এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি জাওয়াহিরির দোষারোপ এবং সমালোচনার শিকার হলেও জাওয়াহিরির দাবি খণ্ডন করতে সেসময় আমি এই বার্তাগুলো ব্যবহার করিনি।

জাওয়াহিরির *Knights Under the Banner* বইয়ে এই যুদ্ধবিরতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে, যদিও জাওয়াহিরি তার দলের সেসব সদস্যের নাম উল্লেখ করেনি যারা এই উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল।

অন্যদিকে, জাওয়াহিরির সমালোচনার তির আমার দিকেই ঘোরানো ছিল এবং তা দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছিল—

১. সে লিখেছে যে আমি সরকার এবং তার আমেরিকান ও ইহুদি মিত্রদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদকে নিচু দেখানোর চেষ্টা করছি। সে আরও বলে, দেশের মধ্যাংশের মন্ত্রী আব্দেল হালিম মুসা যখন অফিসে ছিল, তখন থেকে আমি এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি।

২. সে সমালোচনা করে বলে, আমি আর্থিক সুবিধার জন্য এসব করছি। আমি এমন সুবিধা পাচ্ছি, যেগুলো মিশরের অনেক মন্ত্রীও পায় না। সে বলে যে আমি চাইলে একই দিনে মিশরের যেকোনো কারাগার দেখতে যেতে পারি। আর সরকারকে চাপে ফেলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। সে আরও বলে, কারাগারের বাইরের মিশরের বার্তা কারাগারের ভেতরে নেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং তাদের বক্তব্য প্রেসের কাছে পৌঁছে দিতে আমি সফল হয়েছি। আমাকে ঐতিহাসিক নেতাদের প্রতিনিধি আখ্যায়িত করে সে বলে, আমি তাদের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছি। সে আরও বলে, স্যাটেলাইট এবং রেডিওতে আমি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। কারণ, আমিই কারাবন্দী নেতাদের এবং বাইরের দুনিয়ার মাঝে একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম। তাদের যেকোনো বার্তা আমার মাধ্যমেই বাইরে আসে।

জাওয়াহিরি ইঙ্গিত করে, প্রশাসনের হুমকিতেই অন্য কোনো পথ বাদ দিয়ে আমি এই শান্তিপূর্ণ পন্থায় অগাধ আন্তরিকতা দেখাচ্ছি। সে লিখেছে—

অস্ত্রবিরতি উদ্যোগের নতুন মাত্রার পেছনের কারণ বুঝতে পারবেন, যখন আপনি জানবেন যে, ১৯৯৪ সালে বার অ্যাসোসিয়েশান থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় স্টেট সিকিউরিটি অফিসাররা যায়াতকে বলেছিল, সে যদি রেড লাইন ক্রস করে তাহলে এর বিনিময়ে সে তাদের শুধু সামান্য কিছু খরচ করাতে বাধ্য করবে। আর সেটা হচ্ছে, একটি মাত্র বুলেট।

সে আরও বলে, "জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের সমর্থন যায়াতের চেষ্টাকে উৎসাহ দেয়। নেতারা তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছে আর বিভিন্ন সময়ে সমর্থনও দিয়ে যাচ্ছে।"

জাওয়াহিরি তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের অবস্থান আলাদা করার চেষ্টা করে। সে ব্যাখ্যা দেয়, তাদের জোর করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করানো হচ্ছে আর আমাকেও এই অবস্থানে আসতে জোর করা হয়েছে।

সে ভুলে গিয়েছিল বা ভেবে দেখেনি যে জামাআ আল-ইসলামিয়ার কারাবন্দী নেতারা এত সহজে এমন কিছু করবে না, যেটা তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায়। তারা সবসময়ই সাহসের সাথে তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। পরিণতির কথা না ভেবে শান্তির সময় হোক বা যুদ্ধের সময়, নিজের বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছে। স্টেট সিকিউরিটি কোর্টে যাওয়ার আগে তারা পরিষ্কারভাবে তাদের সরকারবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছে। এমনকি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসও কোর্টের কাছে পেশ করেছে। রক্তিম বর্ণের কাপড় পড়ে যখন তারা কোর্টের বিচার সেশনে আসত, বুঝাই যেত তাদের ওপর নির্যাতন কোন মাত্রায় পৌঁছেছে। এর থেকে বুঝা যায়, তারা মৃত্যুর জন্য উদগ্রীব ছিল। প্রতিশ্রুতি বা উপহার— কোনোকিছুর বিনিময়েই তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়নি। অবশ্য তারা জানত, এসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করাও হয় না। তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতিই তাদের সেটা বুঝিয়েছে। ১৭ বছর কারাবরণের পরই তারা এই যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। মানে তারা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট কঠিন সময় পার করে এসেছে। তখন যেহেতু নিজেদের নীতির সাথে আপোস করার প্রশ্ন আসেনি, তাহলে এখন তো অল্প সময়ের জন্য তাদের ছাড় দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সবশেষে এই নেতাদের মিশরের বাইরে যোগাযোগের জন্য আরও অনেক মাধ্যম আছে। মিশরের বাইরে অবস্থানরত অনেক নেতাকর্মী এখনও তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বিদেশে বসবাসরত সেই

সদস্যরা প্রশাসনের ভয় না করে বিভিন্ন মাধ্যমে এসব তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল।

এই যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপে আমার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে জাওয়াহিরি কিছু অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বলে ফেলে। যেমন—স্টেট সিকিউরিটি অফিসারদের আমাকে মেরে ফেলার হুমকির কথা উল্লেখ করে জাওয়াহিরি বলে, আমাকে এই উদ্যোগের প্রচার করতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার সে-ই বলেছে, ১৯৯৩ সালে কিছু স্কলার ইসলামিক দল এবং মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দেল হালিম মুসার মধ্যে মিটমাট করার জন্য যুদ্ধবিরতির কথা বললে আমার কাছে সেটা ভালো মনে হয়েছিল।

আমি বুঝতে পারছি জাওয়াহিরিকে কত কঠিন পরিস্থিতি পার করতে হয়েছে, যেটা তাকে এসব লিখতে বাধ্য করেছে। যুদ্ধের মাঝে পাহাড়ের গুহায় বাস করা সত্যি কঠিন। তবে জাওয়াহিরি এসব লেখা তার প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে বদলাতে পারেনি। সেজন্য আমি তার সমালোচনা গ্রহণ করেছি। হাশরের ময়দানে নিশ্চয়ই আমি জাওয়াহিরিকে ক্ষমা করে দেব, যেদিন টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন কোনো কাজেই আসবে না। আমি আশা করি আমরা দুজনই সেই ধরনের লোক, যাদের বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, “তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে।”[৭৩]

জাওয়াহিরির প্রতি ভালোবাসা থাকা স্বত্বেও সততার খাতিরে আমাকে সত্য প্রকাশ করতেই হলো। এক্ষেত্রে আমি বিকৃতমুক্ত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এতে জাওয়াহিরিকে ভুল বা হঠকারী রূপে প্রকাশ পেলেও।

জাওয়াহিরি ভুলে গিয়েছে, যেই উদ্যোগের প্রচার আমি করতাম, সেটার প্রচার করার দায়িত্ব জামাআ আল-ইসলামিয়াই আমাকে দিয়েছে, আমার মতাদর্শ জানার পরও। এই পদক্ষেপ নিয়ে দেওয়া আমার অনেক বিবৃতির কথাই সে উল্লেখ করেনি। আমি বারবার বলেছি—

---

৭৩. কুরআন, আল-হিজর (১৪: ৪৭)

৫ জুলাই ১৯৯৭ সালে মিলিটারি কোর্ট সেশনে মোহাম্মদ আল-আমিন আব্দেল আলীমের বক্তব্য শুনে অন্যদের মতো আমিও অবাক হয়েছি। আমি সেখানে অন্যান্য আইনজীবীদের মতো অভিযুক্তদের রক্ষা করার জন্য বসে ছিলাম। তার বিবৃতি প্রস্তুতিতে আমি জড়িত ছিলাম না। আমি বলছি না এটা আমার নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু এটাই সত্যি।

ইসরায়েলের সাথে মিশরের সম্পর্কে স্বাভাবিক দেখাতে প্রশাসনের সাথে সমঝোতা করার জন্য আমি লেখালেখি করেছি—এটা জাওয়াহিরির অন্যায় দাবি। বেশ কয়েকটি ইসরায়েল-মিশর সম্পর্ক বিরোধী সংগঠনের সাথে আমার সম্পর্ক তার এই দাবি খণ্ডন করে। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে এবং ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ের অস্ত্রবিরতির উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা সে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদকে বেগবান করে ফিলিস্তিনকে এবং জেরুসালেমকে ইহুদিদের হাত থেকে মুক্ত করাই এই অস্ত্রবিরতির উদ্দেশ্য ছিল। আমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ বন্ধ করার ডাক দিয়েছি এটাও তার একটা ভুল ধারণা। ইসলামি আন্দোলনের অনেক কর্মীদের জিহাদের ব্যাখ্যার সাথে জাওয়াহিরির জিহাদের ব্যাখ্যার অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইহুদি এবং উম্মাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি এবং ধৈর্যই বিজয় অর্জনের চাবিকাঠি। এটা আমেরিকার ক্ষতি করে অর্জন করা যাবে না। এই জিহাদের জন্য উম্মাহকে ইহুদিদের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক ষড়যন্ত্রের কথা বলতে হবে।

আমাদের অবশ্যই সমাজের কাছে সবধরনের যুদ্ধের কথা ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন—অর্থনৈতিক যুদ্ধ, যেটার মধ্যে পড়ে ইসরায়েল এবং আমেরিকার সকল পণ্য বর্জন করা। সশস্ত্র যুদ্ধের সময় হওয়ার আগে জনগণকে ফিলিস্তিনের পাশে থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে হবে। সামরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার সঠিক সময় এলে পুরো উম্মাহ একসাথে বিজয় অর্জনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। যেই বিজয়ের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতারা বা আমি কেউ কোনো বক্তব্যে এমন কথা বলিনি, যেটা আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। ইসলামি শরিয়াহকে অপমানিত করে এমন কথাও আমরা বলিনি। আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ও আমি গ্রহণ করিনি। জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতারা বা আমি, কেউ-ই ইসলামি শরিয়াহ ছাড়া অন্যকোনো আইন মেনে নিইনি। শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক অন্যকোনো মতবাদ প্রচারও করিনি। আমাদের মতবাদ শুধু জাওয়াহিরিরই দর্শনের বিরুদ্ধে যায়।

জাওয়াহিরি দাবি করেছিল, জামাআ আল-ইসলামিয়া এবং তাদের মিশরে বসবাসরত বা প্রবাসী ভাইদের মধ্যে আমিই একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম; এটি সত্য নয়। যদি সত্যিই হতো, তাহলে সেটি আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় হতো। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামিক মানসিকতার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীও একইভাবে জামাআ আল-ইসলামিয়ার কারাবন্দী নেতাদের সাথে দেখা করত এবং তাদের বয়ান অন্যদের কাছে পৌঁছে দিত। এমনকি প্রবাসী সদস্যদের অনুরোধে তাদের কয়েকজন তোরা কারাগারেও গিয়েছিল, কেন নেতারা এমন পদক্ষেপ নিলেন সেটা জানতে আর আমার ঘোষণার সত্যতা নিরীক্ষা করতে।

তিন বছরে আমি অল্প কয়েকদিন মাত্র কারাগারে তাদের দেখতে গিয়েছি। আর প্রায় এক বছর যাবৎ যাওয়ার সুযোগও করে উঠতে পারিনি। আমি সবসময় এটা নিশ্চিত করেছি, যেন পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস থেকে আমার দেখতে যাওয়ার অনুমতি এলেই আমি যাই। এটা সত্য যে এই অনুমতি কারাগার প্রদর্শনের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এটা ছাড়া কাজটি কঠিন হয়ে যেত। যদিও অনেক তরুণ ইসলামিস্ট আইনজীবী নিয়মিত জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের সাথে দেখা করতে যেত। তারা বরং আমার চেয়ে সহজে সেখানে যাওয়ার সুযোগ পেত। আমার সাথে কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক খুব একটা ঘনিষ্ঠ ছিল না। উপরন্তু আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার ওপর চরম নির্যাতন করার অভিযোগ করেছিলাম। আমি পুরোপুরিভাবে তাদের সাথে সব সম্পর্ক

ছিন্ন করেছিলাম। এটা অবশ্য ইসলামিক দলের পরিমণ্ডলে আমার ভাবমূর্তি উন্নত করেছিল। অনেক আইনজীবী তাদের কর্মসূত্রে ইসলামিক আন্দোলনের রণাঙ্গনে প্রবেশ করে ইসলামি দলগুলোর নেতাদের অনুসরণ করে তাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য। তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পর তারা ইসলামি আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে। আমি আমার ওকালতির খাতিরে ইসলামি কাজকর্মের সাথে যুক্ত হইনি। আধুনিক ইসলামি জাগরণের বংশধর আমি। তরুণ বয়স থেকে আমি এই জাগরণের ছায়াতলে আছি। আমি সাংগঠনিক কাজকর্ম বন্ধ করতে চাইলে জাওয়াহিরি আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। সে উপলব্ধি করেছিল, জিহাদ কেসে সাজা খাটবার পর আমি আর গোপন দলে কাজ করার উপযুক্ত নই। সে পরিস্থিতিতে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া অনেকেই তখন ইসলামিক কার্যক্রমের সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং এর পর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলা শুরু করে। কিন্তু আমি অন্যভাবে আমার ইসলামি পরিচয় ও বিশ্বাস রক্ষা করার পথ বেছে নিই। এই কাজটিও গোপন সংগঠনে কাজ করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আজ ২০ বছর পর জাওয়াহিরি আমাকে সেই কাজটির জন্য সমালোচনা করছে।

জাওয়াহিরি আমার সেইসকল সহকর্মী আইনজীবীর সমালোচনা করেনি, যারা কারাবন্দী ইসলামি জিহাদ দলের নেতাদের বিবৃতি শোনার পর জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের সমর্থন করছে।

১৯৯৭ সালে ইসলামি জিহাদ দলের নেতারা বিবৃতি দেওয়ার আগে AFP এর কাছে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সে বলে, তার দলের কেউ উদ্যোগের সাথে জড়িত নেই। এমনকি তার দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর সে তার বই *Knights Under the Banner of the Prophet*য়ে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

শুধু আমিই জাওয়াহিরির বিরক্তিকর সমালোচনার শিকার হইনি, এই উদ্যোগও সমালোচনার শিকার হয়েছে। *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ের ২৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় সে লিখেছে, এই

পদক্ষেপ দলটিকে লক্ষচ্যুত করেছে। এর লক্ষ ছিল ইহুদি এবং আমেরিকার মতো ইসলামের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী, ইসলামী আইন অমান্যকারী মিশরের সরকারকে উৎখাত করা। হল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিখ্যাত নেতা ওসামা রুশদিরও সে সমালোচনা করে। সে রুশদির বিষয়ে বলে, "১৭ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে সে এই উদ্যোগের বিষয়ে কথা বলেছিল, যখন সে লাক্সরের ঘটনা অস্বীকার করেছিল। রাফেই তাহার সাথে সেই ঘটনা নিয়ে আলাপকালে সে পুনরায় উদ্যোগের বিষয়ে কথা বলে।" এই উদ্যোগ থেকে শাইখ ওমর আব্দেল রাহমানের সমর্থন ফিরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ এনে জাওয়াহিরি রুশদির বিবেচনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। রুশদি সংক্ষেপে তার অবস্থা সম্পর্কে বলে—

এখনও হাজার হাজার সদস্যকে আটক ও নির্যাতন করা হচ্ছে জেনে শাইখ আবদেল রহমান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তিনি তার সমর্থন ফিরিয়ে নেবেন। সম্ভবত সদস্যদের সাথে যোগাযোগের কমতি, তার পরিবার এবং আইনজীবীর কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মিশরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়ায় এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার কিছু নেতাদের কারণে তিনি তার অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

জাওয়াহিরি রুশদির ব্যাখ্যায় মন্তব্য করে—

আমাদের শত্রু মিশরীয় প্রশাসন শাইখের সাথে কেমন আচরণ করেছে, কেমন অত্যাচার করেছে সেগুলো রুশদি ভুলে গেছে। সে এটাও ভুলে গেছে যে শত্রুর সাথে আমাদের এই সংঘাত আদর্শিক সংঘাত। সে বলে শাইখকে প্রশাসনের সাথে ঝামেলা এড়িয়ে চলার উপদেশ দিয়েছে। তার কথা—এর বিনিময়ে প্রশাসন শাইখকে মুক্তি দেবে। সে আরও বলেছে, শাইখের উচিত শান্তিকে প্রাধান্য দেওয়া, সেটা শুধু মিশরের জন্য নয়; আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হওয়া উচিত। দলের সদস্যরা একমত হয়ে যে চুক্তি করতে যাচ্ছে, শাইখের উচিত সেটার সমর্থন করা।

শাইখ ওমর আব্দেল রাহমানের মুক্তির জন্য রুশদি যেই প্রস্তাব দিয়েছে, জাওয়াহিরি সে প্রসঙ্গ তার বইয়ে এনে জামাআ আল-

ইসলামিয়ার অবস্থানের তুলনা করে। "এতগুলো বছরে কী হলো? তাদের মৌলিক বিশ্বাস কি এখনও একই আছে?" জাওয়াহিরি অবাক হয়। সে এই বলে শেষ করে, রুশদির বক্তব্য শুধু তার বিশ্বাসের পরিবর্তন নয় বরং দলের ওপর আঘাত।

জাওয়াহিরির সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় রুশদি আমাকে ইমেইল করে—কষ্টকর হলেও এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে জাওয়াহিরি তার *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ে আমার এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা করেছে সেগুলোর খণ্ডন লিখতে হচ্ছে। খণ্ডন লিখতে কষ্ট হওয়ার কারণ, এটা এমন সময়ে লিখতে হচ্ছে, যখন ড. জাওয়াহিরি কঠিন সময় পার করছে। তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য শহিদ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। সে তার বইয়ে যেসব লিখেছে, আমি তার উত্তর লিখছি। কারণ, আমি এই ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন জট খুলেছি এবং বিভিন্নভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছি। আমি যা লিখছি সেটাকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার অবস্থান মনে করা ভুল হবে, যেহেতু আমি তাদের প্রতিনিধি নই। জাওয়াহিরির সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তোরা কারাগরে। সেখানে আমরা প্রায় তিন বছর একই সেলে ছিলাম। সে ছিল বিনয় আর ভদ্রতার জীবন্ত মূর্তি। কারাগারে থাকা জামাআ আল-ইসলামিয়ার বড় দলটির সাথে সে কখনও মতানৈক্য করেনি, হয়তো তার লাজুক স্বভাবের জন্য। পেশওয়ারে যাবার পর জাওয়াহিরি অনেক বদলে গেছে। সেখানে সে অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সেটা এমন এক পরিবেশ, যেখানে কট্টরপন্থী রাজনীতির প্রচলন চলছিল। ১৯৮৭ সালে সে তানযিম আল-জিহাদ (জিহাদি সংগঠন) নামে নতুন একটি দল গঠন করে। এক বছর পর সে এই দলের নাম পরিবর্তন করে রাখে ইসলামিক জিহাদ। নিজের দলকে অন্য দল থেকে আলাদা করতে সে যখনই সুযোগ পেয়েছে, জামাআ আল-ইসলামিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের এবং এর বিশিষ্ট সদস্যদের সমালোচনা করেছে। সে ভেবেছে, এভাবে সে তার নবগঠিত দলে নতুন সদস্য ভেড়াতে পারবে।

১৯৯১ সালে জাওয়াহিরি ছোট্ট একটি বই প্রকাশ করে; যেখানে সে লিখেছে, একজন অন্ধ ব্যক্তির আমির[৭৪] হওয়া উচিত নয়। সে এটার অনেক কপি পেশওয়ারে বিতরণ করে। পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশেও বিতরণ করে। তার বইয়ে সে লিখেছে, ইসলামিক শরিয়াহ অনুযায়ী একজন ইমামের[৭৫] বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যেমন– সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। অদ্ভুত উদাহরণ! এই বইয়ের মাধ্যমে সে বুঝাতে চেয়েছে, জামাআ আল-ইসলামিয়ার আমির শাইখ ওমর আব্দেল রাহমান ইসলামিক আইন ভঙ্গকারী। আমার মনে আছে, ১৯৯০ সালের এক শুক্রবার আমরা একসাথে জুমার নামাজ পড়েছিলাম। আমরা পত্রিকায় মরহুম ড. আলা মোহিঈ আল-দীনের একটি ছবি নিয়ে কথা বলছিলাম। তার পেছনে একটা পোস্টার ছিল, যেখানে লেখা ছিল–"পারস্পরিক আলোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই।" জাওয়াহিরি পোস্টার বিতরণকারীদের একজনের কাছে একটি কপি চাইল। সে রাগান্বিত হয়ে কথা বলছিল এবং ছোট্ট বিষয়টাকে অনেক বড় বানিয়ে ফেলল। উদ্যোগের দোষারোপ করে সে বলছিল, এটি দলের আদর্শিক পরিবর্তন। আজহারি আলেমের পোস্টারে আলোচনার আহ্বানের যে বিষয়ের উল্লেখ ছিল, সেটা নতুন কোনো বিষয় নয়। তার মানে এই নয় যে, দল কোনো নীতি বিসর্জন দিয়েছে। আলোচনা করতে চাওয়ার মাঝে কোনো ভুল নেই। সে তার বইয়ে আমাকেও একইভাবে অভিযুক্ত করেছে। কারণ, ১৯৮৯ সালের মার্চে আমিও মিশরে আলোচনার কথা বলেছিলাম। অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে আমাকে কারাগারের বাইরে আনা হয়। আমরা ভেবেছিলাম, যে অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের আটক করা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তার বদলে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তৎকালীন মন্ত্রী জাকির বদরের

---

৭৪. আক্ষরিক অর্থে যুবরাজ। এখানে ইসলামি দলের প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭৫. সুন্নিরা 'ইমাম' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি নামাজ পরিচালনা করেন। এখানে মহান ইমাম বলতে মুসলিম উম্মাহর নেতা বা খলিফা বুঝানো হয়েছে।

সাথে আমাদের আলোচনার আয়োজন করা হয়। বৈঠক হওয়ার কদিন আগে যাকির ওয়াফদ পার্টির সংসদ সদস্য তলাত রাসলানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিল মরহুম শাইখ শারাওয়ী আল-গাজালি, ওয়াকফের মন্ত্রী মোহাম্মদ আলি মাহগুব—যার সাথে এর আগেও আমার দুবার দেখা হয়েছিল। আলোচনার পর আমাদের মুক্তি দেওয়া স্টেট সিকিউরিটি অফিসাররাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিন শাইখ বক্তব্য দেওয়ার পর আমাকে কিছু বলতে বলা হলো। আমি বললাম, "আমি কীভাবে কিছু বলব, যখন আমি মাত্রই কারাগার থেকে এসেছি, যেখানে আমাকে কথা বলার জন্যই নির্যাতন করা হয়েছে?" মন্ত্রী সাহেব জোরাজুরি করলে আমি বললাম, কারাগারে অনেক যুবক ও শিশুর ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অফিসাররা জানিয়েছে, শারাওয়ী, গাজালি আর মাহগুব—এই তিন শাইখের ফতোয়া আছে তাদের কাছে। সেই ফতোয়া তাদেরকে নির্যাতন করার অনুমতি দিয়েছে। অফিসারদের কথা অনুযায়ী বৈঠকের দুমাস আগে তথাকথিত এই শাইখরা পবিত্র আল-আজহার মসজিদ প্রাঙ্গণে বসে সেই ফতোয়া দিয়েছেন। আমি আরও বললাম, দশ বছরের কম বয়সী কয়েকজন শিশুকেও আটক করা হয়েছে। তাদের আটক করা হয়েছে ১৯৮৮ সালে আইন শামসের ঘটনায়। অন্ধকার সেলে বাচ্চাগুলো ভয়ে কাঁদে।

এমন সময় শাইখ গাজালি কারাবন্দীদের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করতে শুরু করেন। আল্লাহর বাণী পাঠ করেন,

"যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।"[৭৬]

তিনি আরও বলেন, তিনি কখনোই এ ধরনের ফতোয়া দেননি। শাইখ শারাওয়ীও ফতোয়া দেওয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ আমাদের এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

---

৭৬. কুরআন, সূরা বুরুজ (৩০: ১০)

এরপর আমি তিন শাইখের বক্তব্য এবং আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো নিয়ে কথা বললাম। আমি বললাম, আমরা কিছু লোককে কাফির মনে করি। আমি শাইখদের বললাম যে, বিচার করার আগে আমাদের এসব বিষয়ে যাচাই-বাছাই করা উচিত। আমি ব্যাখ্যা করলাম, কিছু বিকৃত খবরের ভিত্তিতে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি আরও বললাম, আমরা ইসলামবিরোধী কোনো মতবাদ পোষণ করি না। আমরা সেভাবে কুরআন-সুন্নাহ বুঝি, যেভাবে পূর্ববর্তী আলেমগণ বুঝেছেন। আমি আরও জানালাম, আমরা কারও গুনাহর কারণে তাকে কাফির মনে করি না, যদি না সে মনে করে সে যেই গুনাহ করছে সেটা হালাল [ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী বৈধ]। শাইখ শারাওয়ী উত্তর দিলেন, "তাহলে আমরা তোমাকে দোষী মনে করছি না।" আমি তখন বললাম, "তাহলে বাকি কারাবন্দীদের দোষ কী?"

এই বৈঠকগুলো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। তাহলে এসব করা কোন হিসেবে খারাপ হয়? বিপরীতে, আমাদের সম্পর্কে শাইখদের ভুল ভাঙাতে এসব খুবই উপকারী। দেশের সবগুলো পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল সায়ত্বশাসিত হওয়া স্বত্ত্বেও এই বৈঠকটির খবর কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি। তারা টিভিতে আমার ভয়েস ছাড়া শুধু মাত্র একটি ছবিই ব্রডকাস্ট করেছে। আর পত্রিকাতেও আমি যেসব কথা বলেছি সেসব ছাপানো হয়নি। এই বৈঠকের পর জাকির বদর আদেশ দেয় আমাদের এরকম আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। সে তার বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিল এই বলে যে, সে আলোচনাকে স্বাগত জানায়। কারণ, এগুলো ভুলক্রুটি ধরিয়ে দেয়।

জাওয়াহিরি এবং মরহুম শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম সম্পর্কে ওসামা রুশদি বলে—এমনকি শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম পর্যন্ত জাওয়াহিরি আর তার ভাইয়ের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। তারা বিভিন্ন সময় তাকে দোষারোপ করেছে। কখনও সৌদির এজেন্ট বলেছে, কখনও আবার আমেরিকার এজেন্ট বলেছে। জাওয়াহিরির সাথে আমার এক উত্তপ্ত আলোচনার কথা এখনও মনে পড়ে। এটা আযযামের শহিদ হওয়ার কদিন আগের কথা। জাওয়াহিরি আর আমার পেশওয়ারের এক রাস্তায়

দেখা হয়েছিল। আযযামের সাথে সুসম্পর্ক রাখার জন্য জাওয়াহিরি জামাআ আল-ইসলামিয়ার সমালোচনা করছিল। সে আমাকে বুঝাতে চাইছিল আযযাম একজন এজেন্ট। আযযাম তার দুই ছেলে সহ হত্যার শিকার হওয়ার পর তার জানাজাতে জাওয়াহিরির সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তখন সে এই শহিদ শাইখের প্রশংসা করছিল। ড. ওমর আব্দেল রাহমান কারাবন্দী হওয়ার পর তারা একই রকম কাজ করেছিল! তারপর জাওয়াহিরি তার *আল-হাসাদ আল-মুর* বই প্রকাশের মাধ্যমে মুসলিম ব্রাদারহুডের পেছনে লাগে। সে তৎকালীন সকল ইসলামিক ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করেছে। সে বলত, একমাত্র তার দলই সংগ্রামে টিকে থাকবে।

তারপর জাওয়াহিরি সেই ফ্রন্ট সম্পর্কে বলে, যেটা সে ওসামা বিন লাদেনের সাথে গড়েছে।

জাওয়াহিরি যখন তার বিভিন্ন বইয়ে যথেচ্ছা ইসলামিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করছিল তখন আমরা দেখি, ১৯৯৫ সালে সে ইসলামাবাদের মিশরীয় দূতাবাসে আঘাত হানার পরিকল্পনা করছিল। *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ে সে বলে, "অনেক অধ্যয়নের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি দল গঠন করব। ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসে হামলার অভিযোগে সেই দলটিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যদি তারা দূতাবাসে হামলা করতে না পারে, তাহলে পাকিস্তানের অন্যকোনো আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করবে। যদি সেটাও না পারে, তাহলে কোনো পশ্চিমা দূতাবাসে হামলা করবে। আমরা জানি, মুসলিমদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে পশ্চিমারা বিখ্যাত। যদি তারা সেটাও না পারে, তাহলে মিশরীয় দূতাবাসে হামলা করবে।"

এভাবেই তারা নীতিমালা তৈরি করে আর গুরুতর সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই যেকোনো স্বার্থে সহজেই চার মহাদেশের দেশগুলোকে টার্গেট বানানো হয়।

ইহুদি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তৈরি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফ্রন্টও এলোমেলোভাবে গঠিত হয়েছিল। আমরা রাফেই তাহাকে ১৯৯৮ সালে এই ফ্রন্টে স্বাক্ষর করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলে, তাকে টেলিফোনে এই গ্রুপের উদ্দেশ্যের কথা জানানো হয়। আগ্রাসনের শিকার হওয়া ইরাকিদের সাহায্য করার বিষয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। সেই বিবৃতিতে নিজের নাম দিতেও একমত হয়। কিন্তু পরে সে এটা জেনে অবাক হয় যে বিবৃতিটি নতুন একটি ফ্রন্ট গঠনের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। আর এটাতে এমন একটি ফতোয়া প্রকাশ করা হয়েছে, যেটা সকল মুসলিমকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাহা বলে, "জামাআ আল-ইসলামিয়ার কোনো প্রকার পরিষ্কার অনুমোদন ছাড়াই এই ফ্রন্টে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। জামাআ আল-ইসলামিয়া এমন একটি ফ্রন্টে সদস্য হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করল, যেই ফ্রন্টের বিষয়ে তার ধারণাই নেই।"

রাফেই তাহা বলতে থাকেন, "ড. আইমান আল-জাওয়াহিরি ও তার দলের সদস্যরা মিশরে পরিচালিত একটি অপারেশনেও সফল হতে পারেনি। কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণেও তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সেই কম্পিউটারে তাদের দলের সখর সদস্য এবং মিশরীয় সমর্থকদের নাম-ঠিকানা ছিল। ফলে তাদের এক হাজারেরও অধিক সদস্য-সমর্থক গ্রেফতার হয়ে পড়ে। যে কারণে জামাআ আল-ইসলামিয়া যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করার আগেই সে সমস্ত সামরিক অপারেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল, তারপরও সে তার জামাআ আল-ইসলামিয়ার ভাইদের ঘোষিত পদক্ষেপকে অগ্রাহ্য করছে। যদি জাওয়াহিরি এই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যানই করে থাকে, তাহলে সে নিজ দল থেকে কোনো অপারেশন চালাচ্ছে না কেন?"

জাওয়াহিরি বিভিন্ন সময় শুধু আমার আর জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাদের অবস্থানই পৃথক করে দেখানোর চেষ্টা করেনি, জামাআ আল-ইসলামিয়ার প্রবাসী নেতৃস্থানীয় নেতা রাফেই তাহা আর ড. ওমর আব্দেল রাহমানের মধ্যেও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছে। সে

শুধু আমার সমালোচনাই করেনি, আমার কাজকর্ম নিয়ে তাচ্ছিল্যও করেছে। সে বলেছে—

আসলে মুনতাসির আল-যায়াত নিজেকে শুধু জামাআ আল-ইসলামিয়ার অনুমোদিত প্রতিনিধিই ভাবছে না, বরং নিজেকে এত বড় মনে করছে যে, সে বলছে—রাফেই তাহা আর ওমর আব্দেল রাহমানের বিবৃতি জামাআ আল-ইসলামিয়ার অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না।

জাওয়াহিরির এই কথাটা বলে বাস্তবতাকে প্যাঁচানোর চেষ্টা করেছে। সে ভালো করেই জানে, রাফেই তাহা এবং ওমর আব্দেল রাহমান দলের সদস্যের কাছে অত্যধিক সম্মানীয় ব্যক্তি। সে এ-ও বলেছে, আমি আগ বাড়িয়ে তাদের প্রতিনিধি হতে চাচ্ছি। সে ভালো করেই জানে, আমার আত্মমর্যাদাবোধ কতটা প্রখর। ১৯৮৪ সালে সবধরনের দলের সাথে সম্পর্ক শেষ করার পর আমি কোনো দলের পক্ষ থেকে কথা বলিনি। সে ভালো করেই জানে, আমি যদি ভুল করেও সে ধরনের দাবি করতাম, তাহলে জামাআ আল-ইসলামিয়া ঘোষণা করে দিত আমার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এমনটা ঘটেনি। জাওয়াহিরি ভেবেছিল, এমন কথা বললে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃস্থানীয় সদস্যরা এই উদ্যোগ থেকে সরে আসবে আর ঘোষণা করবে—এই পদক্ষেপে আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু সে সফল হয়নি, আর হবেও না। কারণ, জামাআ আল-ইসলামিয়া নিজ থেকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোস্তফা হামজা নামের জামাআ আল-ইসলামিয়ার এক সদস্য আমাকে বলেছে, জাওয়াহিরি আমার সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য দলকে চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু দলের নেতা তোরা কারাগার বা বিদেশে থাকা নেতা-কর্মী, এমনকি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাফেই তোহাও তার অনুরোধকে পাত্তা দেয়নি। জনসাধারণের সামনে জামাআ আল-ইসলামিয়ার সাথে আমার সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের গোড়া কেটে দেওয়াই ছিল তার বই লেখার আসল উদ্দেশ্য।

জাওয়াহিরির দাবির বিপক্ষে আমার জবাব

প্রথমত, ড. ওমর আব্দেল রাহমানের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শাইখ বিভিন্ন সময়ে আমার প্রতি উষ্ণ ভালোবাসা দেখিয়েছেন। যেমন—১৯৮২ সালে আমি যখন গ্রেফতার হয়েছিলাম, নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট জখমের চিকিৎসা করতে তখন তিনি কাজ করেছিলেন। তিনি একজন জ্ঞানী নেতা ছিলেন। তিনি জানতেন কীভাবে ছেলেদেরকে প্রভাবিত করতে হয়। ইহুদি এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমাকে একটি প্রেস কনফারেন্সে ডাকা হলে আমি একটি শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান করেছিলেন। আমি আশা করিনি, আমার বক্তব্যের সে অল্প কয়েকটি লাইন আমেরিকার কারাগারে বন্দী আব্দেল রাহমানের নজর কাড়বে। এই উদ্যোগের সমর্থনে তার কাছ থেকে ব্যক্তিগত বার্তা পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়ত, ড. ওমর আব্দেল রাহমানের যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপ থেকে সমর্থন সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণার পর আমার অফিসে একটি প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে আমি নিশ্চিত করেছিলাম, তিনি এই পদক্ষেপ বাতিল করেননি; বরং তিনি এর থেকে নিজের সমর্থন সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি কারাবন্দী বিখ্যাত নেতাদের হাতে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। এই কাজটি করার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি একজন বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নমনীয় নেতা। কেননা, তিনি যদি এই পদক্ষেপ বাতিল করে দিতেন, তাহলে কারাবন্দী অন্যান্য নেতারা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তেন, আঘাত পেতেন। পদক্ষেপ বাতিল করতে তাদেরকে এক প্রকার জোর করা হতো। সেকারণে আমি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে চাই যে ড. ওমর আব্দেল রাহমান নিজের সমর্থন সরিয়ে নিলেও তিনি অন্যদের জন্য এই উদ্যোগের বিষয়ে মূল্যায়ন এবং অধ্যয়নের পথ খোলা রেখেছিলেন।

জাওয়াহিরি তার *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ে এই বলে আমার উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছিল যে, আমি প্রেস কনফারেন্সে ওমর আব্দেল রাহমানের দেওয়া বার্তা গোপন করেছি। যেসব কথা আমি প্রেস কনফারেন্সে বলিনি সেগুলো ছিল তার ব্যক্তি, পারিবারিক এবং জামাআ আল-ইসলামিয়ার কারাবন্দী নেতাদের বিষয়ে গোপনীয় কথাবার্তা। সর্বসাধারণের জন্য এগুলো মাথাব্যথ্যার বিষয় নয়। একেবারে শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে প্রেস কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমন লোকদের প্রতিরোধ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যারা শুধু ধ্বংস চায়, অশান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের নিজের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কর্মক্ষমতাকে ভালোভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। একের পর এক অশান্তি আমাদের জন্য ভালো নয়। প্রেস কনফারেন্সের সময় আমি কখনোই নিজেকে জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতাকর্মীদের চেয়ে অগ্রাধিকার দিইনি। আমার দেওয়া তথ্যে সব পরিষ্কার ছিল আর জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতারা সেটার সমর্থনও করেছে। যেমন—আমি বলেছিলাম, মোস্তফা হামজা আমাকে ফোনকল করেছিল, কিন্তু জাওয়াহিরি সে কথা উল্লেখ করেনি। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

তৃতীয়ত, জাওয়াহিরির পুরাতন বক্তব্যে এবং তার *Knights Under the Banner of the Prophet* বইয়ে এই বিষয়টি এড়িয়ে গেছে যে ড. ওমর আব্দেল রাহমান ১৯৯৭ সালের ৫ জুলাই যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কোনোপ্রকার চাপপ্রয়োগ ছাড়াই আমেরিকার কারাগার থেকে আব্দেল রহমান যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেটাও যেন সে দেখেও দেখেনি। আব্দেল রাহমানের আগের অবস্থানের কথা জাওয়াহিরি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছে। কারণ, এটা তার সকল সমালোচনাকে খণ্ডন করে।

চতুর্থত, ড. ওমর আব্দেল রাহমান তার ছেলে আব্দুল্লাহকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল। সেখানে সে নিশ্চিত করেছিল, এই উদ্যোগ এখনও অনুমোদিত এবং আমি সেটার প্রচারণা চালিয়ে যেতে পারি। এই বার্তার

কথাও জাওয়াহিরি উল্লেখ করেনি। লন্ডনভিত্তিক আল-হায়াত সংবাদপত্র এই পুরো বার্তাটি ছেপেছিল।

পঞ্চমত, জামাআ আল-ইসলামিয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাফেই তাহার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে সবসময় আমাদের সাথে যোগাযোগ চালিয়ে গেছে, এমনকি সে যখন এই উদ্যোগের বিপরীতে মত দেয় তখনও। আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কেন আমি এই উদ্যোগকে সমর্থন জানাচ্ছি সেটা বুঝার জন্য সে সব বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করত। সিরিয়ায় একেবারে আত্মগোপন করার আগ পর্যন্ত সে কখনও আমার সাথে যোগাযোগ করা বন্ধ করেনি। আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন।

জাওয়াহিরির ভুলের মাশুল অন্য ইসলামিস্টদের দিতে হয়েছিল

ওসামা বিন লাদেনের সাথে জাওয়াহিরির সম্পর্ক গভীর হচ্ছিল। অন্যদিকে যেসব মিশরীয়রা আফগানিস্তানে জাওয়াহিরির মূল ভ্রমণের সাক্ষী ছিল, তাদের সাথে তার সম্পর্ক শীতল হয়ে আসছিল। আমি পরের দলের লোকদের মধ্যে পড়ি।

জিহাদ কেসে কারাগারে আমি তার পাশে ছিলাম। এ কারণে যারা তার মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বা তার কাজকর্ম পছন্দ করে তাদের সাথে আমার কিছু সমস্যা দেখা দেয়। আফগানিস্তানে মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের আমীর হবে জাওয়াহিরি—এই ঘোষণা পাওয়ার পর তাকে সমর্থন করি আমি। এতেও যারা তার মতের বিরুদ্ধাচরণ করে বা তাকে অপছন্দ করে তাদের সাথে আমার ঝামেলা হয়। যেমন—মিশরীয় আর্মির সাবেক কর্নেল মোহাম্মদ ইব্রাহিম মেকাওয়ী নিষ্ঠুরভাবে আমার ওপর আক্রমণ করে। মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের পুনর্জাগরণের অভিযোগে ১৯৮৭ সালে প্রশাসন মেকাওয়ীকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু আফগানিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সে বেঁচে যায়। সেখানে গিয়ে সে ইসলামিক জিহাদ দলে যোগ দেয়। অবশেষে জাওয়াহিরির সাথে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে সে দল ছেড়ে দেয়। সম্ভবত, মন্ত্রী হাসান আল-আলফির হত্যা চেষ্টায় ব্যর্থতার জন্য তারা একে অপরকে দোষারোপ করছিল। আরেকটি মতানৈক্যের কারণ, দুজনেই দাবি করত ১৯৯৪ সালে বিচার সম্পন্ন হওয়া *তালে আল-ফাতেহ* দলের সদস্যরা তাদের অনুগত । দুজনেরই মিডিয়ার সামনে একে অপরকে দোষারোপ করার অভ্যাস ছিল। ১৯৯৪ সালে লন্ডনভিত্তিক আল-হায়াত পত্রিকা মেকাওয়ীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। সেখানে সে জাওয়াহিরিকে CIA এর এজেন্ট এবং ইরানের সহযোগী বলে দোষারোপ করে। জাওয়াহিরি মিশরীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করছে বলেও সে অভিযোগ করে।

আল-হায়াত পত্রিকার কায়রোর সংবাদদাতা মোহাম্মদ সালাহর কাছে আমি একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। এরপর থেকে মেকাওয়ীর সাথে আমার সমস্যা শুরু হয়। ইন্টারভিউয়ে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম, *তালে আল-ফাতেহ* কেসের অভিযুক্তরা জাওয়াহিরির প্রতি অনুগত; মেকাওয়ীর সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। আমি এই কথা বলেছিলাম কারণ, এটাই সত্যি, জাওয়াহিরিকে জয়ী করার জন্য আমি বলিনি। *তালে আল-ফাতেহ* এর সদস্যদের কেন্দ্র করে জাওয়াহিরি আর মেকাওয়ীর মতানৈক্য বিষয়টি সালাহ ভালোভাবেই জানত। সেকারণে সালাহ আমার ইন্টারভিউটি প্রকাশ করতে চেয়েছিল। সে জানে আমি সত্যি বলছি– অভিযুক্তরা জাওয়াহিরির প্রতি অনুগত। এই কেসের চারটির মধ্যে সেশনে সালাহ উপস্থিত ছিল। সে দেখেছিল, অভিযুক্তরা চিৎকার করে জাওয়াহিরির নাম বলছে আর তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বন্ধুত্ব থাকা স্বত্ত্বেও মেকাওয়ী জনসম্মুখে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। এমনকি মিশরে আমি তার আইনজীবীও ছিলাম। সে আমাকে আর সালাহকে জাওয়াহিরির এজেন্ট বলে অভিযোগ করে। এই অভিযোগটি গুরুতর ছিল। কারণ, এটা আভাস দেয় যে, জাওয়াহিরির বিরুদ্ধে যে কাজগুলোর জন্য অভিযোগ আছে, সেই সবগুলো কাজে আমরা তার দালাল। ধর্মীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এই আক্রমণের কোনো মানে ছিল না। আমি কখনও আফগান জিহাদে তার কর্মকাণ্ড নিয়ে মেকাওয়ীর সাথে তর্ক করিনি। তার মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বের ইতিহাস নিয়েও কথা বলিনি। জাওয়াহিরি আর *তালে আল-ফাতেহ* এর সদস্যদের বিষয়ে সত্য কথা বলার পুরস্কারস্বরূপ সে জনসম্মুখে আমাকে দোষারোপ করেছে। অন্য একজনের মাধ্যমে জাওয়াহিরি আমাকে বার্তা পাঠিয়েছিল যে, মেকাওয়ীর মিথ্যা ধারণা ভাঙতে আমার চেষ্টা দেখে সে খুশি হয়েছে। আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, মেকাওয়ীর বদনাম করার জন্য আমি এমনটা করিনি। *তালে আল-ফাতেহ* এর সদস্যদের বিষয়ে সত্য প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন ঘটনায় জাওয়াহিরির সাথে আমার সম্পর্ক এমনই ছিল। তার মিশর ছেড়ে যাওয়ার আগে বা পরে আমাদের সম্পর্ক ছিল

শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার। যদিও আমাদের ঝোঁক আর মতাদর্শে ভিন্নতা ছিল।

১৯৯৪ সাথে জাওয়াহিরি আফগান ছেড়ে ওসামা বিন লাদেনের সাথে সুদানে গেলে আমাদের বোঝাপড়া অন্যদিকে মোড় নেয়। এই সফর বিন লাদেনের সাথে তার সম্পর্ক শক্তিশালী করে। কিন্তু যেই চেনা-পরিচিত মিশরীয়রা তার সাথে আফগানিস্তান যায়নি, তাদের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা কমতে শুরু করে। ওসামা বিন লাদেনের সাথে বন্ধুত্বের কারণে তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তার সমালোচনাও করেছিল। ১৯৯৬ সালে সে যখন আফগানিস্তানে ফিরে এলো, তখন সে একেবারে বদলে গেল। যেই মানুষটাকে আমরা চিনতাম, তারচেয়ে ভিন্ন একজনে পরিণত হলো সে।

সুদানে জাওয়াহিরি তার আশেপাশের পরিবেশের অংশে পরিণত হয়েছিল। শুধু মিশরে পরিচালিত অপারেশনগুলোয় ব্যর্থতার কারণেই সে বিন লাদেনের নেতৃত্ব মেনে নিতে দৃঢ় ছিল না, দলের অর্থনৈতিক পুঁজি শেষ হওয়াও একটি কারণ ছিল।

জাওয়াহিরির নেতৃত্বে তার দল এমন একটি সংগঠন ছিল. মিশরকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনের ছত্রছায়ায় সেটা আল-কায়েদার একটি পাঁজরে পরিণত হলো। খ্যাতির শীর্ষে থাকা জাওয়াহিরি সহকারীর জায়গা পেলো। এইভাবে দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামিক জিহাদকে জাওয়াহিরি একটি নতুন দলের সাথে যুক্ত করেছিল। যেই দল পরবর্তীতে সব ইসলামি আন্দোলন আর তাদের প্রধানদের নাড়া দিয়েছে। এই দলের কার্যক্রম বিভিন্ন ইসলামি দল এবং ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেছে, জাওয়াহিরি আর বিন লাদেনের ঝোঁকের সাথে যাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। ইসলামিক জিহাদের সেই সদস্যের স্বীকারোক্তি আমি উল্লেখ করেছিলাম, যাদের আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং আজারবাইজান থেকে মিশরে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই কোনো অপারেশন পরিচালনা বা দলীয় কাজে এসব দেশে

যায়নি, তারা সেখানে নিরাপদ আশ্রয় এবং কাজের খোঁজে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই শুধু তাদের বেতনের একটি অংশ দেওয়ার মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত ছিল।

জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের প্রভাব

জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপ—জাওয়াহিরি যেটার বিরোধিতা করেছিল—সেটার ভালো প্রভাব পড়েছিল মিশরে। এর প্রভাবে মিশরীয় প্রশাসন পুরো মিশরে সবধরনের দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো বন্ধ করে দেয়। এই পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়ার আগে কোনো ইসলামি দলই নিরাপদ ছিল না। মনে হচ্ছিল নেতাকর্মী বা সদস্যদের আটক করার অভিযান কখনও শেষ হবে না। সেসময় মিশরীয় প্রশাসন শত শত, এমনকি হাজার হাজার সদস্যদের বন্দী রেখে অজুহাত দেখাচ্ছিল—এই পরিবেশে তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। অপরদিকে কর্মীদের কাজকর্মের প্রতিশোধ নিতে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো। এই উদ্যোগের কারণে বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকা অনেক মানুষ মুক্তি পায়। যারা মুক্তি পায়নি তাদের জন্যও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যাও মিশরীয় প্রশাসন কমিয়ে দেয়। মিডিয়া এবং রাজনীতির ময়দানে জামাআ আল-ইসলামিয়ার ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়। জনসাধারণ এবং ইসলামি দলগুলোর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও জামাআ আল-ইসলামিয়ার আইন বৈধতা হাসিল করার পক্ষে কথা বলে। এটা পূর্বে চিন্তাও করা যেত না। এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দলটি ইউরোপে নিপীড়িত রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। আর দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সদস্য সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। তবে স্বীকার করতে হবে, এই সব উন্নতি প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনতে দলটির সদস্যরা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাতে এই ছোট ছোট সুবিধার চেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরচেয়ে বেশি কিছু তাদের প্রাপ্য ছিল। যাহোক, আমি মনে করি অন্যরাও শেষ পর্যন্ত এই পদক্ষেপের

অনুসরণ করেছিল। কিন্তু তারপর ১১ সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে। পুরো বিশ্বে আমেরিকা স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনে লেগে পড়লে যুদ্ধবিরতি পদক্ষেপের মাধ্যম অর্জিত সব উন্নতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হামলার প্রভাব

১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা হামলার কারণে পুরো বিশ্বের ইসলামিস্টরা চাপের মুখে পড়ে। এমনকি যেই ইসলামিক দলগুলো আমেরিকাকে টার্গেট করেনি, তাদেরও এই বোকামির ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। আমার কথাকে ভুল বুঝার আগে বলে দিই, কোনো ইসলামিস্ট বা জাতীয়তাবাদী আমেরিকার বন্ধু হতে পারে না। কারণ, তারা মুসলিম, বিশেষত আরবদের বিরুদ্ধে নানারকম দুষ্কর্মে লিপ্ত। তাদের দুষ্কর্মের কেবল সারমর্ম লিখতে গেলেও আমার বই শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা সবাই একমত যে আমেরিকার বিরুদ্ধাচারণ করা ইসলামি দায়িত্ব। কিন্তু কীভাবে এই সুপারপাওয়ারের সাথে মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে ইসলামিস্টদের মধ্যে, বিশেষত আমার আর জাওয়াহিরির মতানৈক্য রয়েছে। আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তিদের বিরুদ্ধে বিন লাদেনের অসতর্ক প্রতিশোধস্পৃহা, আন্তর্জাতিক ইসলামিক আন্দোলনের প্রভাব, আমেরিকা এবং অন্যান্য সরকারকে চোখের সামনে ইসলামিস্টদের ধ্বংস করার ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। সেপ্টেম্বর ১১ এ ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে হামলার আগে বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরি আমেরিকানদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেখানে তাদের এই ঘটনার সাথে যুক্ততার সঠিক প্রমাণ দেওয়া ছিল না। এই ঘটনার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল বিন লাদেনের ১৯৯৩ সালের সোমালিয়ান অনুসারীরা। সোমালিয়ায় তারা ফারাহ ইদিদের দলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রিয়াদ আর আল-খুবারে আমেরিকান মিলিটারি ক্যাম্পে হামলার[৭৭] সময়, নাইরোবি আর দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে হামলার সময়ও তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। এই অপারেশনগুলোতে বিন লাদেন তার সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেনি। সে যা

---

৭৭. ১৯৯৬ এর জুনে সৌদি আরবের আল-খুবার টাওয়ারে আমেরিকানদের আস্তানায় বোমা হামলা করে ১৯ আমেরিকান চাকরিজীবীকে মেরে ফেলা হয়।

করেছে তা হলো, কয়েক সপ্তাহ পর স্ক্রিনের সামনে এসে যারা এই অপারেশন করতে গিয়ে ইসলামের জন্য 'শহিদ' হয়েছে, তাদের প্রশংসা করা। সে তার এই ছদ্মনামে কাজ করার বিষয়টিতে পরিবর্তন আনে ১১ সেপ্টেম্বরের পর। একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে এসে সে আমেরিকানদের হুমকি দিতে থাকে এবং কৌশলে সেই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার কথা বলে। সে দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসেবে জাওয়াহিরি ও আবু গায়থকেও তার সাথে স্যাটেলাইট চ্যানেলে কথা বলার সুযোগ দেয়। তারাও বেশ আক্রমণাত্মক কথা বলে। এর ফলে পশ্চিমা মিডিয়া একটি সুযোগ পায়। বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে বলে গুজব রটাতে থাকে। পশ্চিমা মিডিয়া এ-ও বলতে থাকে যে আল-কায়েদা আমেরিকান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কারণ, তারা এমনসব পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়, যেগুলোতে শুধু আফগান এবং আরব-আফগানরাই পৌঁছাতে পারে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে অনেকেই আফগানদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। তারা পরে এটা দেখে ধাক্কা খান যে তালিবান উত্তরের বিভিন্ন জোট এবং পশতুন জাতির হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। এই যুদ্ধে তালিবানের একটার পর একটা শহর হাতছাড়া হওয়া শুরু করে। একপর্যায়ে তারা পুরো আফগানিস্তানে তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। এই তালিবানের মতো একটি সরকার যারা বছরের পর ইসলামিস্টদের রক্ষা করে আসছিল, বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরির কারণে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল।

উত্তরের জোটগুলোর ওপর আমেরিকার বোমা বর্ষণের কারণে নিহত হওয়া একের পর এক ইসলামিস্টদের নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতায় জায়গা করে নিতে লাগল। অল্প জ্ঞান-বুদ্ধির সিদ্ধান্তে পরিচালিত সেপ্টেম্বর ১১ এর হামলার কারণে এমন অনেক মানুষ যুদ্ধের মুখে পড়ল, যারা এই হামলার সাথে জড়িত থাকতেই চায়নি। আল-কায়েদার মতো অন্যকোনো দল সেখানে ছিল না। আফগানিস্তানের সব ইসলামিস্ট আল-কায়েদার সাথে যুক্ত ছিল না। এমন অনেক ইসলামিস্ট নিহত হয়েছে, যাদের বিন লাদেনের সাথে কোনো সম্পর্কই ছিল না।

এমনকি অনেকে বিন লাদেন আর তার দলের মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করত। একইভাবে সোভিয়েত জিহাদের সময় জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে পাড়ি জমানো অনেক ইসলামিস্টকেও বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির ভুলের মাশুল দিতে হয়। মুসলিম উম্মাহর হাজারও শ্রেষ্ঠ যুবক আফগানিস্তানে জিহাদের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। তারা সেখানে বিয়ে করে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। তাদের সন্তানেরা কোনো অপরাধ না করেও বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির কারণে আমেরিকান বোমা হামলার শিকার হয়। এই হামলা শুরুর পূর্বেও আফগানিস্তানে পাড়ি জমানো আরবরা তাদের নিজেদের দেশের সরকারের নিপীড়নের শিকার হয়। হামলার কারণে এই চিত্র নতুন রূপ পায়। অনেকেই যেই বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে—নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে হামলার আগে জাওয়াহিরি কি ভেবে দেখেনি এর বিপরীতে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কী হবে? আর বাস্তবেই কি আল-কায়েদা এই হামলার সাথে জড়িত? আমি জাওয়াহিরির ওপর জোর দেব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি—বিন লাদেন নয়, জাওয়াহিরিই এই হামলার মূল হোতা। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, সে আমেরিকার এমন শক্তিশালী পাল্টা জবাব আশা করেনি। যুদ্ধের মূলনীতি হলো, কোনো কাজ করার আগে শত্রুপক্ষের জবাব হিসেব করা। তার ভুল মূল্যায়ন তাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া নাইরোবি আর দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে হামলার প্রতিক্রিয়ার মতো হবে। আমেরিকানরা আফগানিস্তানের দুয়েক জায়গায় বোমা বা মিসাইল হামলার বেশি কিছু করবে না। তার বুঝা উচিত ছিল, কাজ যত ভয়ানক তার প্রতিক্রিয়াও ততটাই ভয়ানক হবে। তার জানা উচিত ছিল, সেপ্টেম্বর ১১ এ জখম হওয়া সিংহ তার সম্মান রক্ষার জন্য, পূর্বের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

বিন লাদেন জাওয়াহিরিকে পাশে নিয়ে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা বিষয়ে বলেছিল, যদিও এর পেছনে সরাসরি নিজেদের যুক্ততা স্বীকার করেনি, আবার অস্বীকারও করেনি। আমি যখন এই ভিডিও দেখছিলাম,

তখন আমার ইসলামিক জিহাদ দলের প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল, সেসময় তারা কোনো হামলার কয়েক ঘন্টার পরপরই এর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা জানিয়ে দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত। অনেকে মনে করে, তাদের এই কাজটি মিশরীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের ইসলামিক জিহাদের সদস্যের বিষয়ে অনুসন্ধানের রাস্তা সহজ করে দিত। তারপরও দলটি তাদের নীতির সাথে আপোষ করেনি। দলগুলো সত্যটা সবার সামনে স্বীকার করে নিত। কারণ, তারা জানত—আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এইভাবে দায় স্বীকার করে নেওয়া দলের মিলিটারি অপারেশন বাস্তবায়নের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের পর বিন লাদেন আর জাওয়াহিরি দায় স্বীকারের পরিবর্তে রাজনৈতিক কৌশলকেই প্রাধান্য দিলো। একই সাথে দায় অস্বীকার করার উপায়ও তাদের ছিল না। কারণ, তারা আমেরিকানদের টার্গেট করেনি এমনটি অস্বীকার করলে তাদের আশ্রয়দাতা তালিবান বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেত। আমেরিকার জবাবের ভয় তাদের দায় স্বীকার করতে বাঁধা দিয়েছে। অদ্ভুত বিষয় হলো, আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, এমনকি যখন তালিবান হেরে যাচ্ছিল তখনও তারা পরিষ্কারভাবে তাদের দায় স্বীকার করেনি, আবার অস্বীকারও করেনি।

কিন্তু বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির কর্মকাণ্ড মিশরের এবং অন্য জায়গার ইসলামিস্টদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। এই আক্রমণের ফলাফল দেখে সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। বিন লাদেন ও জাওয়াহিরি আদৌ এই আক্রমণের সাথে জড়িত কি না পরিষ্কার প্রমাণাদি না থাকায় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তেও পৌঁছাতে পারছিল না তারা।

মৌলবাদী এবং শান্তিপ্রিয় দুধরনের ইসলামিস্টদের অনেকেই মিশরীয় কর্মীদের বিন লাদেনের সাথে যুক্ত করার জন্য জাওয়াহিরির সমালোচনা করে। মৌলবাদী ইসলামিস্টরা ধরে নেয়, আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধ মিশরীয় প্রবাসীদের মিশরে ফিরে এসে মিশরীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আশা ভেঙে দিয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের পর

কোনো রাষ্ট্রই আমেরিকাকে শত্রু হিসেবে অভিহিত করার সাহস করতে পারছে না। একটি পশ্চিমা রাষ্ট্র সেখানে বসবাসকারী একজন ইসলামিস্টকে তার নিজ দেশের হাতে তুলে দেবে—এমনটা কেউ আগে কল্পনাও করত না। এই ঘটনার পূর্বে ইসলামিস্টরা মনে করত, কোনো ইউরোপীয়ান দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেই সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়া যাবে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের পর সবকিছু বদলে গেল। যেমন—সুইডেন আহমেদ হুসাইন ওগায়জা এবং মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুলাইমানকে হস্তান্তর করে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম আরও ইসলামিস্টদেরও হয়তো হস্তান্তর করা হবে। ব্রিটেনে সেখানে বসবাসরত অনেক ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়। একইভাবে আসসাউত, সুহাজ[৭৮] এবং মিনয়াতেও প্রচারণা চালানো হয়।

এটি গোপন নয় যে, আমি কয়েকজন ভাইকে ইউরোপে আশ্রয় পাওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য সহযোগিতা করেছিলাম। এর কারণে মিশরীয় প্রশাসন ক্ষিপ্ত হয়। তারা মিশরে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এ বিষয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করতে আমাকে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছিল। এমনকি কায়রোর বিভিন্ন ইউরোপীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কারণ, মিশরীয় প্রশাসনকে ক্রুদ্ধ না করতে তারা কাজকর্মকে দীর্ঘায়িত করছিল। প্রবাসী ভাইদের ওপর চাপ কমানোর জন্য আমি বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের সাথেও কাজ করেছি। জাওয়াহিরি আমাকে ইংল্যান্ডে স্থায়ী হওয়ার কথা বলেছিল এবং আশ্রয় অর্জনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার ওয়াদা দিয়েছিল, কিন্তু আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম। এর পেছনে কারণ ছিল, আমি জানতাম প্রবাসী ভাইদের জন্য আমি মিশর থেকে যেই কাজটা করি, আমি না থাকলে সে কাজটা করার মতো কেউ থাকবে না।

এমনকি মুসলিম ব্রাদারহুডও আমেরিকান প্রচারণার শিকার হয়। মূলত সেখানে ইসলামের সকল বিষয়ের বিরুদ্ধেই কথা বলা হচ্ছিল।

---

৭৮. আপার ইজিপ্টের কয়েকটি শহর।

আমেরিকানরা তাকওয়া ব্যাংকের[৭৯] বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়, যদিও এই ব্যাংকের সাথে আল-কায়েদা বা ইসলামিক জিহাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

জাওয়াহিরি তার *আল-হাসাদ আল-মুর* বইয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের সমালোচনা করলে দলটি আবিষ্কার করল তারা এমন কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে যার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কারণে এটি মৌলবাদী ইসলামিস্টদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখত। আববুদ আল-যুমারের সব ইসলামি দলকে এক করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার বদলে ইসলামি দলগুলোর ফাটল বাড়তে থাকে আর তাদের শত্রুর জন্য সহজলভ্য করে দেয়।

এখন এটি লেখার সময়ও আমি জানি না জাওয়াহিরি বেঁচে আছে কি না। আমি জানি, আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধের কারণে তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তার স্ত্রী আযযা নুওয়ার এবং ছেলে মুহাম্মদ আমেরিকার বোমা হামলায় নিহত হয়েছে—এই সংবাদ আমাকে আঘাত করেছে। আমি আশা করছি, আমেরিকানদের হামলা থেকে সে বেঁচে যাবে। তবুও আমাদের বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষত, জাওয়াহিরির এমন কিছু কথা জনসম্মুখে বলার পর, যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে বলা উচিত ছিল। বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্য সে কিছু সত্য গোপন করেছে। বিকৃত বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ, এর মাধ্যমে আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারি। জামাআ আল-ইসলামিয়ার শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পরও দলটির দুজন সদস্য ফারিদ সালেম কাদওয়ানি এবং আলা আব্দেল রাজিককে প্রশাসন হত্যা করে। এর ফলে দলটি কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। সবাই দলটির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল, দলের সদস্যরা প্রতিশোধ নেয় কি না। আমি এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা

---

৭৯. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা হামলার পর বুশ সরকার ব্যাংকটিকে জঙ্গি সংগঠনকে আর্থিক সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত করে। মধ্য প্রাচ্যের বেশ কজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এর অংশীদার ছিল।

জানাই। দলটিও তাদের সদস্যের হত্যায় নিন্দা প্রকাশ করে। জামাআ আল-ইসলামিয়াই শান্তিপূর্ণ পন্থা বেছে নিয়েছিল আর এ কাজের জন্য দলের সদস্যদের কেউ জোরও করেনি। সুতরাং যাই ঘটে থাকুক না কেন, এর ফলে সদস্যরা পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসেনি। তারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের এই পদক্ষেপ ও সময় নিয়ে দলকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়নি। জামাআ আল-ইসলামিয়া তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল আর তারা ধর্মীয় ও নৈতিক নীতিমালায় ছাড় না দিয়ে কর্মপন্থা সাজিয়েছিল। এই পন্থা অবলম্বন করলে প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করা সহজ হতো দলটির জন্য। অথচ এমন একটি পন্থার ফলাফল সম্পর্কে জাওয়াহিরি ভালোভাবে ভেবেই দেখেনি। জামাআ আল-ইসলামিয়া আর ইসলামিক জিহাদ জোটের নেতৃত্ব সম্পর্কে জাওয়াহিরির অবস্থান আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি আরও বলেছি, যারা এই জোটে ফাটল ধরিয়েছে, জাওয়াহিরি তাদের মধ্যে অন্যতম। একই সময়ে জামাআ আল-ইসলামিয়ার প্রধান শাইখ ওমর আব্দেল রাহমানের সমস্যার কথা বলে জাওয়াহিরি বিন লাদেনের সাথে ঐক্যজোট গঠন করে। শাইখ ওমর আব্দেল রাহমান মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে বর্তমানে একটি আমেরিকান জেলে বন্দী আছেন।

ইহুদি-ক্রুসেডাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদ ফ্রন্টের একটি বিবৃতি দেখে আমি অবাক হয়েছি। সেখানে তারা বলেছে, শাইখ ওমর আব্দেল রাহমান নাইরোবি এবং দারুস সালামে তাদের বোমা হামলা ঘটানোর অন্যতম কারণ। প্রায় বছরদুয়েক পর বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে শাইখ ওমর আব্দেল রাহমানের বিষয়ে একটি প্রেস কনফারেন্সে কথা বলছিল। তারা শাইখ আব্দেল রাহমানের ছেলে মুহাম্মদকে তার বাবার সম্পর্কে কিছু বলার জন্য বলে। তারপর থেকে শাইখের ছেলে মুহাম্মদ ও আহমেদকে পুরো বিশ্বের নিরাপত্তার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা আল-কায়েদার সদস্য হিসেবে ধরে নেয়। যদিও কোনো দেশেই, এমনকি মিশরেও ওয়ান্টেড

লিস্টে তাদের নাম ছিল না। মিশরীয় সরকার জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে কোনো কেসেও জামাআ আল-ইসলামিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কথা আনেনি। উল্লেখ্য, শাইখের ছেলে মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ), আহমেদ সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) নামেও পরিচিত ছিল। কিন্তু আল-কায়েদার সাথে সম্পর্কের জের ধরে আফগানিস্তানের তোরাবোরায় আমেরিকার বোমা হামলায় আসাদুল্লাহ মারা যায়। তার কদিন পর তার ভাই সাইফুল্লাহ আমেরিকান কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ে। তাকে আটক করে আমেরিকানরা এমন ভাবে সেটা প্রচার করতে থাকে যেন তারা আল-কায়েদার বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে আটক করতে পেরেছে। আফগানিস্তানে হামলা ফলপ্রসূ হচ্ছে—আমেরিকান নাগরিকদের এমনটা বুঝানোর জন্য এরকম প্রতারণামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। আমরা সবাই জানি, শাইখের দুই ছেলে দশ বছরের বেশি সময় ধরে আফগানিস্তানে বসবাস করে আসছে। তারা আল-কায়েদা বা ইসলামিক জিহাদের সাথে কাজও করেনি। কিন্তু শত শত বা হাজার হাজার ইসলামিস্টদের মতো তাদেরকেও এমন ভুলের মাশুল দিতে হলো, যেটা তারা করেইনি। শাইখের পরিবার আমেরিকান জেল থেকে তার মুক্তির প্রায় সবরকম ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। এখন তাদের সাইফুল্লাহর জন্যও একই চেষ্টা করতে হবে।

যদিও শাইখের মুক্তির বিষয়টি সবার জন্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কিন্তু বিষয়টি এখনও জামাআ আল-ইসলামিয়ার বিষয়। যেহেতু তারাই তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। দলটি তার ওপর কোনো প্রকার চাপ না বাড়িয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই দলটি ১৯৭৭ সালে ল্যাক্সর অপারেশন পর্যন্ত অনেক অপারেশন বাস্তবায়ন করে এসেছে। তারা চাইলেই মিশরের বাইরে বা ভেতরে কোনো আমেরিকানকে টার্গেট বানানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু বিচক্ষণ এই দলটি সঠিক হিসাবনিকাশ কষেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শাইখের কোনো উপকারেই আসবে না। তারা জানত, আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপই শাইখের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে জামাআ আল-

ইসলামিয়ার কারাবন্দী নেতারা আল-হায়াত পত্রিকায় যখন ইহুদি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইসলামি জিহাদি ফ্রন্ট গঠনের বিবৃতি দেখল—যেখানে রাফেই তাহার স্বাক্ষর ছিল, তারা তখন আমার দ্বারা তার কাছে বার্তা পাঠায়। বার্তাটিতে বিবৃতিতে উল্লেখিত ফ্রন্টটির পন্থা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল। তারা তার কাছে জানতে চায়, কেন সে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে, জামাআ আল-ইসলামিয়াকে এই জোটের সাথে যুক্ত করেছে যেখানে তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এটিই বলে দেয়, ১৯৯৮ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে কেন তাহা এই ঘোষণা দেয় যে সে এরকম কোনো দলিল বা হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেনি। তাহা বলেছে, তাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আমেরিকান বিমান হামলার শিকার হওয়া ইরাকিদের সমর্থনে সে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করবে কি না। সে রাজি হয়েছিল। দূর্ভাগ্যবশত জাওয়াহিরি তার শেষ বইয়ে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য পেশ করতে নাকচ করে দেয়। তাদেরকে বিব্রত করবে এমনসব প্রমাণ সে এড়িয়ে গেছে। ইসলামিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর থেকে আমার উদ্দেশ্য ছিল সব ইসলামি দলের আমার ইসলামিস্ট সহকর্মীদের সাহায্য করে ইসলামের উন্নতি করা। এ কারণে মিশরীয় প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক প্রেস আমাকে কোনো দলভুক্ত করতে পারেনি। তারা যখন আমাকে ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের সাহায্য করতে দেখেছে তখন ইসলামিক জিহাদের সদস্য বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার জামাআ আল-ইসলামিয়ার সদস্যদের রক্ষা করতে দেখেছে। কোনো দলের সাথে যুক্ত নয়, ইউরোপের দেশে আশ্রয় চায় না—এমন লোকদেরও সাহায্য করতে দেখেছে।

একটি ছেলের মৃত্যুদণ্ড ও একজন দলীয় নেতা হত্যা

ইসলামিক জিহাদ দলের নেতারা যেই নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলোর কারণে একত্র হয়েছিল, এক পর্যায়ে সেই পয়েন্টগুলো হারিয়ে গিয়েছে। এই পয়েন্টগুলো ছিল দলটির প্রধান ড. আব্দেল মুইযকে কেন্দ্র করে। ড. আব্দেল মুইয জাওয়াহিরির কোড নেইম। দলের লোকেরা তাকে বুঝাতে এই নামটি ব্যবহার করত।

ইসলামিক জিহাদে বেশ কয়েকটি কমিটি ছিল। জাওয়াহিরির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই কমিটিগুলোর প্রধান হিসেবে থাকত। যেমন—অর্থনৈতিক কমিটির কাজ ছিল গ্রুপের অপারেশন পরিচালনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা আর সুষ্ঠুভাবে তা বণ্টন করা। আরেকটা কমিটি ছিল সিভিল কমিটি। এই কমিটির কাজ দলে নতুন সদস্য নিয়ে আসা। এই কমিটি সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত, তাদের শ্রেণিবিভাজন করত এবং উত্তম উপায়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করত। মিলিটারি কমিটি, বিশেষভাবে মিশরীয় আর্মি থেকে সদস্য সংগ্রহের কাজ করত। শরিয়াহ কমিটি ফতোয়া প্রদানের কাজ করত এবং এ সম্পর্কে গবেষণাও করত। শরিয়াহ কমিটির কাজ সুনিশ্চিতভাবে সামরিক অপারেশনগুলো বৃদ্ধির সাথে জড়িত করা। কারণ, এই কমিটি দলের কোনো সামরিক অপারেশনের বৈধতা ঘোষণার কাজ করে। এটি অন্যদের সমালোচনার জবাব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের বিরোধিতাও করে।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার এজেন্ডা ইসলামিক জিহাদ দলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে। আটক হওয়া যেকোনো সদস্য তথ্য সংগ্রহের একটি মাধ্যমে। এদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তথ্য বের করা যায়। এই তথ্য যেকোনো বিষয়ে হতে পারে—গ্রুপের কোনো কার্যক্রম বা নেতাদের কোনো পরিকল্পনা। সেজন্য সদস্যদের শুধু তার ভূমিকাটুকুই জানানো হয়। যখন কোনো সদস্য দলের নেতাদের প্রতি আনুগত্য বা বিশ্বস্ততার খেলাফ করে তখন তারা সচেতন হয়ে যায়, তাকে তার ভূমিকার বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কিছু কৌতূহলী সদস্য থাকেই যারা অতিরিক্ত

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। দলের নেতারা তাদের দিকে ভালোভাবে নজর রেখে নিশ্চিত করে যে সে কোনো তথ্য সংগ্রহ করছে কি না। খুব বেশি দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দলে নেওয়া হতো না। কারণ, দেখা যায়, তাদের অতিরিক্ত কৌতুহলপ্রিয়তা দলের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

এই শক্তিশালী নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে ইসলামিক জিহাদ ভালোভাবে তাদের অপারেশনের সংখ্যা বাড়াতে পেরেছিল। যদিও গত কয়েক বছর যাবৎ তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কিছু বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন—*তালে আল-ফাতেহ* কেসে তাদের প্রায় বারোজন সদস্য গ্রেফতার হয়। আলবেনিয়া থেকে কয়েকজনকে এবং আজারবাইজান থেকে আহমেদ সালামা মুবারককে মিশরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দলটি বরাবরই গ্রেফতারকৃত সদস্যদের স্থানে যোগ্য ব্যক্তিদের বসাতে পেরেছে। যখনই তাদের কোনো সদস্যদের মাধ্যমে তথ্য বাইরে গিয়েছে, দলটি তাদের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। যাহোক, জাওয়াহিরি অস্বাভাবিক অবস্থায় বেশ কিছু ভুল করে ফেলেছে। মিশর ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই সে এরকম অবস্থার শিকার হয়ে আসছে। তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে। এজন্য বর্ডারে অনুপ্রবেশ করতে হয়েছে, ধাওয়া খেতে হয়েছে। বিনয়ী হওয়ার স্বত্ত্বেও জাওয়াহিরি সবসময় তার নিজের মতামতের ওপর জোর দেয়। একারণে যারা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সে। এ কারণে তার দলের মধ্যে ফাটল ধরে।

Knights Under the Banner of the Prophet বইয়ে জাওয়াহিরি এমন অনেক ভুলে যাওয়া ঘটনা তুলে আনে। যেগুলো বেশ কয়েকজনের কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটা হিসেবে কাজ করেছে। সে অনেক কন্টকাকীর্ণ বিষয়ে কথা বলেছে, আবার অনেক বিষয় এড়িয়ে গেছে। যার ফলে তার বইয়ে পুরো চিত্র উঠে আসেনি, তাছাড়া সত্যতাও নষ্ট হয়েছে।

ইসলামিক আন্দোলন এত এত বিপদের মুখে পড়েছে যে ইসলামিস্টদের এর ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়েছে। সে কারণে আমরা গ্রুপের উদ্দেশ্য হতে নিজেদের ব্যক্তিগত ভিন্নতাগুলোকে দূরে রাখতে শিখেছি। জাওয়াহিরির প্রকাশ করা তথ্য অনেককে বিপদে ফেলেছে, কাউকে বিব্রত করেছে। কলঙ্কিতও করেছে অনেক ইসলামিস্টকে। সে পূর্বের কথা টেনে এনে আমাকে সেসব বিষয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য করেছে। আমি এখানে তিনটি অস্পষ্ট ঘটনা নিয়ে কথা বলব। দুটি নিরাপত্তা কমিটির সাথে আর একটি জাওয়াহিরির সাথে জড়িত।

একটি ছেলের ফাঁসি

সিভিল ও মিলিটারি কোর্টে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ইসলামিস্টদের জন্য আমার মতো ইসলামিস্টরা সবসময় আল্লাহর কাছে আর্তনাদ করে। আমরা মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছি, ইসলামিস্টদের রক্তপাত বন্ধ করতে তারা যেন মিশরীয় সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। ইসলামিস্টদেরকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমা করেছি। তার দলের সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় জাওয়াহিরি বিভিন্ন আর্টিকেল, বই, প্রেস বক্তব্যে সিভিল ও মিলিটারি কোর্টের ব্যাপক সমালোচনা করেছে। যাহোক, জাওয়াহিরি এতই নিষ্ঠুর হয়েছিল যে সে তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর ছেলেকে হত্যা করে ছেলেটির বাবার সামনেই। ছেলেটি জাওয়াহিরির প্রতিষ্ঠা করা শরিয়াহ কোর্টে দোষী সাবস্ত হয়েছিল। সেই কোর্‌ট বলেছিল, সে গোয়েন্দাগিরি করে দলের কর্মকাণ্ডের তথ্য মিশর সরকারের কাছে পাচার করে। আমার মনে পড়ে, আমি যখন ছেলেটির হত্যার বিষয়ে শুনি, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। যেই লোকটা আমাকে খবরটি দিয়েছিল তাকে অবিশ্বাস করেছিলাম, তাকে মিথ্যাবাদী ভেবেছিলাম। কারণ, সে জাওয়াহিরির নামে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিল, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করছিল। দূর্ভাগ্যবশত, আমি আবিষ্কার করলাম খরবটি সত্য ছিল। ছেলেটি ছিল ১৫ বছর বয়সী মুসআব মুহাম্মদ শারাফ। তার কাজকে জাওয়াহিরি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছিল। তাকে দলের বেশ কজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সামনে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যাতে আগামীতে কেউ এরকম অপরাধ না করে। ইসলামিক জিহাদের নিরাপত্তা কমিটি এই ছেলেটির বিচার পরিচালনা করেছিল। কারণ, বিষয়টি দলের নিরাপত্তাসংক্রান্ত ছিল। জাওয়াহিরি যখন ইসলামিক জিহাদ দলের শত শত সদস্যদের নিয়ে ওসামা বিন লাদেনের সাথে সুদানে থাকত, তখন নিরাপত্তা কমিটি খেয়াল করে—তাদের তথ্য মিশর সরকারের কাছে পাচার হচ্ছে। তথ্যের মধ্যে ছিল—দলের কার্যক্রম, জাওয়াহিরি আর তার

লোকদের অবস্থানবিষয়ক তথ্য। নিরাপত্তা কমিটির কিছু সদস্য বুঝতে পেরেছিল জাওয়াহিরি খার্তুমে যেই বাড়িতে থাকছিল, মিশরীয় সরকার সেটার ওপর নজরদারি রাখছে। ইসলামিক জিহাদ একটি বিস্ফোরণ হওয়া থেকে প্রতিরোধ করে, যেটা জাওয়াহিরি যেই হাসপাতালে ছিল সেটার দরজার কাছে স্থাপন করা হয়েছিল। অনুসন্ধান করার পর কমিটি আবিষ্কার করে, মিশর সরকার দলের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। দলের নেতাদের মিটিংয়ে যেসব আলোচনা হচ্ছে সেসব তথ্য তারা জানতে পেরে যাচ্ছে। মিশরীয় প্রশাসন ছোট্ট শারাফকে কিনে নিয়েছিল। সে ছিল ইসলামিক জিহাদ দলের অন্যতম নেতা মুহাম্মদ শারাফের ছেলে। তারা সন্দেহজনক জায়গায় তার ছবি তোলে এবং গ্রুপে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য হুমকি দেয়। এটি ঘটেছিল ১৯৯৪ সালে, জাওয়াহিরি তখন সুদানে থাকত। সুদান ইন্টেলিজেন্স এই ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তারাই আবিষ্কার করেছিল যে ছেলেটি মিশর সরকারের গোয়েন্দার কাজ করছে। সুদান সরকার জানত মিশরের গোয়েন্দাবাহিনী সুদানে সক্রিয়। কিন্তু তারা এই তথ্য প্রকাশ করেনি। একজন সুদানি কর্মকর্তা জাওয়াহিরিকে বিষয়টি জানায়। আর জাওয়াহিরি বিষয়টি নিরাপত্তা কমিটির হাতে ছেড়ে দেয়। জাওয়াহিরির ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি বলে, এই ঘটনা জাওয়াহিরিকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। সে ছেলেটির বাবা মুহাম্মদ শারাফের সাথে অনেক সময় কাটাত, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করত। অনেকে এই ঘটনার জন্য মুহাম্মদ শারাফকে দল ছেড়ে যেতে বলে। শারাফ বেশ কঠিন সময় পার করছিল। দলের শীর্ষস্থানীয় সদস্য হিসেবে তাকে বিচার সম্পন্ন হওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ তার ছেলেকে বন্দুক দিয়ে হত্যা করার ঘটনা তাকে দেখতে হবে। জাওয়াহিরি তাকে বিষয়টি সুদান প্রশাসনের হাতে হস্তান্তর করার কথাও বলেছিল। বিশেষত, কয়েকজন সুদানি কর্মকর্তা শরিয়াহ কোর্টের প্রতিষ্ঠা, সুদানের মাটিতে জাওয়াহিরির আইন পরিচালনা দেখে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। সুদান সরকার এই বিষয়েও চিন্তিত ছিল যে মিশর সরকার তাদের ছোট্ট এজেন্টের হত্যার বদলা নিতে পারে। এই ঘটনা বলে দেয়, জাওয়াহিরির আচরণ কত কঠোর হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটির

মৃত্যুদণ্ড এটা বুঝায় যে তারা দলের নিরাপত্তা বিষয়ে কারও বেইমানি মেনে নেবে না। এ ক্ষেত্রে মানবতার চেয়ে যুদ্ধ কৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আবু খাদিজা হত্যা

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, জাওয়াহিরিকে সাদাত হত্যার পর গ্রেফতার করা হয়। সেসময় অত্যাচারের মুখে সে শহিদ এসাম আল-ক্বামারির অবস্থান বলে দেয়। এর ফলে মিশরীয় প্রশাসন ক্বামারিকে আটক করতে সফল হয়। এই ঘটনা ছিল জাওয়াহিরির জন্য একটি দুঃসহ বোঝা। কারণ, ক্বামারির সাথে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ক্বামারির মতো আমরাও কখনও জাওয়াহিরিকে এই কাজের জন্য দোষ দিইনি। কেননা আমরা জানি, অসহনীয় নির্যাতনের কারণে সে ক্বামারির অবস্থান বলতে বাধ্য হয়। সাদাত হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলার সময় আমরা ক্বামারির গ্রেফতার হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে চলি, যাতে জাওয়াহিরির কষ্ট না বাড়ে। অন্যদিকে ইসলামিক জিহাদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বেলায় জাওয়াহিরি অন্য ধরনের আচরণ করে, যেমন আচরণের স্বীকার সে নিজে হয়নি। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মিশরীয় ইসলামিস্টদের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ আব্দেল আলীম—যিনি আবু খাদিজা নামেও পরিচিত—আরেকজন সদস্যের অবস্থান সম্পর্কে মিশরীয় সরকারকে জানিয়ে দেয়। ফলে প্রশাসন ঐ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়। আবু খাদিজা ইসলামিক জিহাদের অনুগত সদস্যদের একজন ছিল। ১৯৮০ দশক জুড়ে তার সুন্দর আচরণের জন্য তিনি ইসলামিস্টদের মাঝে প্রচণ্ড শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইসলামিক জিহাদে যোগ দেওয়ার আগে আফগানিস্তানে জাওয়াহিরির সাথে কাজ করার আগে সে আবু ওবায়দা আল-বেনশারির (আলি আল-রাশেদী) ভালো বন্ধু ছিল। রাশেদি কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত না হয়ে সারাজীবন ইসলামি আন্দোলনের জন্য কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আফগানিস্তানে গিয়েই সে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদায় যোগ দেয় এবং মিলিটারি লিডার হওয়া পর্যন্ত সেই সংগঠনের হয়ে কাজ করতে থাকে। লেক ভিক্টোরিয়ায় ডুবে সে শহিদ হয়ে যায়। আবু খাদিজা ও রাশেদি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। যার কারণে রাশেদি আবু খাদিজার আফগানিস্তানে আসার ব্যবস্থা করে দেয়।

আফগানিস্তানে আবু খাদিজা ইসলামিক জিহাদে যোগ দেয় এবং সরাসরি জাওয়াহিরির সাথে কাজ করে। পাকিস্তানের পেশওয়ারের একটি এতিমখানায় সে কাজ করত। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। তারপরও দলের জন্য সে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য তাকে তার স্ত্রী সন্তান ছেড়ে যেতে হয়। সে তাদের প্রচণ্ড মিস করত আর আফগানিস্তানে থাকার পুরোটা সময় তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করত। সে জাওয়াহিরিকে তার ইচ্ছার কথা জানায়। বলে, সে তাদের দেখার জন্য মিশরে যেতে চায় এবং তাদেরকে আফগানিস্তানে আনার চেষ্টা করতে চায়। জাওয়াহিরি আবু খাদিজাকে বুঝানোর চেষ্টা করে যাওয়াটা তার জন্য ভালো হবে না। সে ভয় পাচ্ছিল, মিশরীয় প্রশাসন হয়তো তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু আবু খাদিজা নিজের সঙ্কল্পে দৃঢ় ছিল। নিরাপত্তা কমিটি তার মিশরে ফিরে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে লাগল। তারা ঠিক করেছিল একটি নকল পাসপোর্ট দিয়ে এমন একটি পথ দিয়ে মিশরে যেতে হবে, যে পথে মিশরে পৌঁছাতে হলে বেশ কয়েকটি দেশ অতিক্রম করতে হয়। এতে মিশরীয় প্রশাসন সহজে তাকে ট্র্যাক করতে পারবে না। এত পরিকল্পনা স্বত্ত্বেও বিমানবন্দরে পৌঁছামাত্রই মিশরীয় কর্তৃপক্ষ তাকে ধরে ফেলে। দলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য তারা তার ওপর ভীষণ অত্যাচার চালায়। আবু খাদিজা প্রশাসনকে ইসলামিক জিহাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এসাম আব্দেল যায়িদের অবস্থা জানিয়ে দেয়। আব্দেল যায়িদ তখন কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মিশরে অনুপ্রবেশ করেছিল। আবু খাদিজা তার তথ্য জানিয়ে দেওয়ার পরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এখন পর্যন্ত সে জেলে আছে।

আবু খাদিজার স্বীকারোক্তিই আব্দেল যায়িদের ধরা পড়ার মূল কারণ—এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির কারণে ইসলামিক জিহাদের সদস্যরা কঠোর আচরণ দেখিয়েছিল। সেসময় ইসলামিক জিহাদ আফগানিস্তানকে ব্যবহার করার মাধ্যমে নিজেদের সাংগঠনিক অবস্থা সম্পূর্ণ করার চেষ্টায় ছিল। জাওয়াহিরি ও নিরাপত্তা

কমিটির সদস্যরা দলের সদস্যদের মাধ্যমে হওয়া ক্ষতি বন্ধ করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

অবশেষে মিশর সরকার আবু খাদিজাকে ছেড়ে দেয় আর দীর্ঘ সময় ধরে বিচারকার্য সম্পাদনের পর তার পাসপোর্ট ফেরত দেয়। মুক্তি পাওয়ার পর সে বুলাক আল-দাকরুরে থাকত। সেসময় আমিও সেখানেই থাকতাম। তার সাথে বহুবার দেখা করেছি আমি। সে আমাকে বলেছিল, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলের লোকেরা তার সাথে জঘন্য আচরণ করছে। তার ধারণা, হয়তো জাওয়াহিরির উসকানিতেই তারা এমনটা করছে। আমি তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম, জাওয়াহিরি তার ওপর অসন্তোষ কি না এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তার স্ত্রী-সন্তানকে অল্প কয়েকদিনের জন্য সৌদি আরব থেকে মিশরে নিয়ে আসে। আবু খাদিজা ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। আমার পরামর্শ উপেক্ষা করে সে সৌদি আরবে তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে চলে যায়। সেখানে পবিত্র মসজিদে সে হঠাৎ করে জাওয়াহিরির ওপর আঘাত করে বসে। সে জাওয়াহিরিকে বুঝানোর চেষ্টা করে, যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার হওয়ার কারণে হয়েছে। আর আব্দুল যায়িদের আটক হওয়ার মূল দায় তার নয়। জাওয়াহিরি তার সাথে ঠান্ডা আচরণ করে। তারপরও আবু খাদিজা সেই এতিমখানায় কাজ করার জন্য আফগানিস্তানে ফিরে আসে। কয়েক সপ্তাহ পর সে ইসলামাবাদ হয়ে জেদ্দার পথে যাওয়া শুরু করে, তার পরিবারকে আফগানিস্তানে আনার জন্য। পাকিস্তানের ইসলামিক দল হারাকাত আল-আনসার তাকে সহযোগিতা করছিল। ইসলামিক জিহাদ গুজব রটালো যে সে কার এক্সিডেন্টে মারা গেছে। তারা দাবি করছিল, আবু খাদিজার একটি কার আছে। এই কারে সে ইসলামাবাদ থেকে পেশওয়ারে যাতায়াত করে। যদিও অনেক লোক বলে থাকে সেখানে কোনো দূর্ঘটনা ঘটেনি। আর ইসলামিক জিহাদের নিরাপত্তা কমিটি ভান করে, হারাকাত আল-আনসারের তত্ত্বাবধানে যেই স্থানে সে থাকত সেখানে কেউ একজন তার সাথে দেখা করতে আসে। এই ঘটনার পর সে উধাও হয়ে যায়। দলটি এভাবে আবু খাদিজাকে সরিয়ে ফেলায় কয়েকজন ইসলামিস্ট সহকর্মী

দুঃখ প্রকাশ করছিল। একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে ফোন করে জানতে চায়, মিশর ছেড়ে পালাতে আমি আবু খাদিজাকে সাহায্য করেছিলাম কি না। আমার মনে হয় এটা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন যে, আমি আবু খাদিজার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সাথে যুক্ত কি না। এই ঘটনাটি এখনও বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে।

পদত্যাগ খেলা

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাওয়াহিরি ইসলামিক জিহাদ দলের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছিল, কারণ দলের শীর্ষস্থানীয় অনেক ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেনের আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদ ফ্রন্টে যোগ দিতে রাজি হচ্ছিল না। ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা এমন কোনো নেতা দেখিনি, যিনি অনুসারীদের মতের দাম না দিয়ে নিজের মত মেনে নেওয়ার জন্য তাদের চাপ দেয়। বেশ কজন ইসলামিস্ট সহকর্মী আমাকে বলেছে, জাওয়াহিরি অন্য সদস্যদের মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই ওসামা বিন লাদেনের সাথে যোগ দিয়েছিল। অন্যরা বিশ্বাস করত, এত তাড়াতাড়ি আমেরিকাকে খেপিয়ে তোলাটা দলের জন্য ক্ষতিকর হবে। এর ফলে দলটি বিভিন্ন দেশে যে কয়েকটি শাখা গড়ে তুলেছে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা আরও বলেছিল, এই কাজ মিশরে দলটির কার্যক্রম কমিয়ে দেবে। তারা বিতর্ক করে, ওসামার আমেরিকাবিরোধী কাজে দলটির নিজেকে যুক্ত করা ঠিক হবে না। আর এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও ইসলামিক জিহাদ বা এর সদস্যের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। অনেক সদস্য আমাকে বলেছে, জাওয়াহিরির বিচার-বিবেচনায় তারা আশ্বস্ত হতে পারেনি। সে বলেছিল, এই ফ্রন্ট তাদের দলের উদ্দেশ্য হাসিলের পথটা সহজ করে দেবে। ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে। সে বলেছিল, দলের সদস্যরা কোথাও ভবিষ্যতে সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে সেদিকে এগুতেই চায় না। সে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দেখাতে চেয়েছিল। যখন তাদের সরকারেরা আমেরিকার হাত গুটিয়ে বসে আছে, তখনও ইসলামিস্টরা আমেরিকাকে ভয় করে না। সে মনে করত, একবার মুসলিম উম্মাহ ফ্রন্টের সাহসিকতা সম্পর্কে ধারণা পেলে ফ্রন্টের সমর্থন করবে। এই মতানৈক্যের কারণে বেশ কজন সদস্য তাদের কাজকর্ম স্থবির করে দেয়। জাওয়াহিরির মৌন সম্মতি আদায়ে পদত্যাগ করার ভয় দেখাচ্ছিল। ফলাফল জেনেই সে এমন খেলা খেলেছিল। দলটির শুরুর

দিকে দলের অর্থনৈতিক পুঁজি সবসময় দলের সদস্যদের কাছ থেকেই আসত। মিশরের অপারেশনগুলোতে ধারাবাহিক ব্যর্থতা, অধিকাংশ সদস্যের আটক হওয়া অর্থনৈতিক উৎসকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। ফলে দলটি বিন লাদেনের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। জাওয়াহিরির সাথে বিন লাদেনের সম্পর্ক বিষয়টিকে আরও নিশ্চিত করে তোলে। দলের সদস্যরা জানত যে এই স্রোত বন্ধ হয়ে গেলে দলটি নির্ভর করার সর্বশেষ জায়গাটা হারিয়ে ফেলবে; দল ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে যাবে। দলটি নিজেদের সামনে শুধু একটি উপায়ই দেখল—জাওয়াহিরির পদত্যাগ প্রত্যাখ্যান করা।

সংগ্রাম চলছেই

বেশিরভাগ ইসলামিস্ট, বিশেষ করে মিশরের ইসলামিস্টরা স্বীকার করবে যে, জাওয়াহিরির পন্থার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পুরো বিশ্বের ইসলামিক দলগুলোকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলা ইসলামিস্টদের নতুন এক চ্যালেঞ্জিং যুগে নিয়ে এসেছে। তাদের এখন নতুন চ্যালেঞ্জটি বুঝতে হবে। আমেরিকানরা সকল ইসলামি দলকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে। এমনকি আল-কায়েদা, ওসামা বিন লাদেন বা জাওয়াহিরির সাথে যুক্ত না থাকা দলগুলোকেও তারা ছেড়ে দিতে চায় না। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ধর্মীয় বৈধতা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রশ্নবিদ্ধ। ইসলামিক দলগুলোর ভবিষ্যত ও হামলার ফলে তৈরি হওয়া নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সক্ষমতাকেও তারা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এর ফলাফল আফগানিস্তান যুদ্ধ ও পুরো বিশ্বে ইসলামিক দলগুলোর সদস্যদের খুঁজে খুঁজে বের করে চালানো নির্যাতন। এই হামলা নতুন বিশ্বায়ন এনে দিয়েছে—নিরাপত্তার বিশ্বায়ন। পশ্চিমা দেশগুলো ইসলামিস্টদের আটক করতে সাহায্য করার জন্য আরব ও ইসলামি দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নতি করছে। এই হামলা আল-কায়েদার হিংস্রতা তুলে ধরে পশ্চিমাদেরকে ইসলামের ওপর কালিমা ছুড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে আরব ও মুসলিম মিডিয়ায় ওসামা বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির কথাবার্তা এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে আমেরিকা সতর্ক ছিল। তাদের জনপ্রিয় বক্তব্যগুলো ছিল ফিলিস্তিনের সমস্যা নিয়ে। আর ফিলিস্তিনের সমস্যার মূল কারণ ইহুদিদের হিংস্রতা এবং তাদের প্রতি আমেরিকার অটল রাজনৈতিক সহযোগিতা। আরব ও মুসলিম সমাজের জন্য এ বিষয়টি হৃদয়ের গভীরে থাকা একটি বিষয়। জাওয়াহিরি আমেরিকানদের প্রতি একটি বার্তা দিয়েছিল। সেখানে সে আমেরিকার কর্মপন্থার কারণে আরব ও মুসলিমদের প্রতি হওয়া

অন্যায়ের বিষয়ে কথা বলেছিল। এই বক্তব্য তাকে বেশ জনপ্রিয়তা এনে দেয়। সে ইরাকি লোকদের ওপর হওয়া বোমা হামলা ও ইরাকি শিশুদের ওপর চালিত গণহত্যার উদাহরণ এনেছিল। ক্রুসেডার জন গারাঙের সহযোগিতায় সুদানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র, সেই সাথে আমেরিকার সুদান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার কথাও সে উল্লেখ করেছিল। এটি সত্য যে জাওয়াহিরি আর বিন লাদেনের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ঘুমন্ত উম্মাহকে জাগিয়ে দেওয়া, ইসলামি সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটানো যা অন্যসব অচল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে যাবে। এই বিষয়টি প্রত্যেক আরব, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ আরব লোকটি মুসলিম উম্মাহর নাজুক অবস্থা দেখে কষ্ট পায়, যে কষ্ট কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বিষয়টি সব ইসলামিক আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের প্রথমে আরব ও মুসলিমদের ঐক্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। দখল হওয়া অনেক মুসলিম ভূমি মুক্ত করতে এটার প্রয়োজন। তাহলে আরবরা ফিলিস্তিন মুক্ত করার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। আল-কায়েদা মিডিয়ায় যেভাবে কথা বলে সেটা বাদ দিতে হবে। বিন লাদেন আর জাওয়াহিরির মতাদর্শ, যেখানে আমেরিকান প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা মূল উদ্দেশ্য—এ ধরনের মতাদর্শও বর্জন করতে হবে। এই মানসিকতার কারণে ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে, ইয়েমেনে, ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলা করা হয়েছিল। এ ধরনের আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা, বর্ণবাদ, ক্রুসেডার, পশ্চিমা সভ্যতা ইত্যাদি গভীর সমস্যার সমাধান করা যায় না। ইসলামি একতা অর্জনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ ধরনের সাময়িক হামলা কিছু সমর্থক আর কিছু বিরোধিতাকারী সৃষ্টি করার মাধ্যমে আমাদের বিভক্ত করে দেয়। নীতিনির্ধারণীতে ভারসাম্য আনা উচিত আমাদের। সেই সাথে এমন ফ্রন্ট গঠন করা উচিত, যেটা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্তকারী মানবরচিত সীমানা অতিক্রম করে যাবে। বিচ্ছিন্নতাবাদি যেকোনো দল

বা ব্যক্তিকে আমাদের বর্জন করা উচিত, তাদের মাঝে ইসলামের শত্রুদের পরাজিত করার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইসলামি আন্দোলন নানা রকম কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বলেন বিভিন্ন সরকার, শাসকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এর নেতারা সবসময় ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ইসলামি আন্দোলন মাঝেমধ্যেই এর অনুসারীদের রক্তের মাধ্যমে সজীবতা পেয়েছে। তারা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নেতাদের কথা মেনে নিয়েছে। এই আন্দোলন তখনই কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছে, যখন এটি জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইজতিহাদকে (সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা) কমিয়ে দিয়েছে। কঠিন সময় পার করা স্বত্ত্বেও ইসলামি আন্দোলন স্বৈরশাসক ও দমনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসছে। এই যুদ্ধে সবসময় একজন করে বলিষ্ঠ ব্যক্তি সামনে থাকে। ইতিহাস বলে, প্রশাসন নির্বিশেষে নিষ্ঠুরভাবে ইসলামি দলগুলোকে সমূলে উৎখাত করতে চাইলেও তাদের নিঃশেষ করতে পারেনি।

এমনকি ইসলামি সাম্রাজ্যের দুর্বল সময়ে—অটোমান খিলাফতের সময়ে—ইসলামি ব্যক্তিত্বরা জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষা করতে ও ইসলামি শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। ইসলামি দেশগুলোর মৈত্রীসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অটোমান সুলতান আব্দেল হামিদ মুসলিম জাতিকে দৃঢ় করতে চেয়েছিল। এমন ব্যক্তিত্বরা ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিশর দখলকে প্রতিহত করে। তার ইসলামিক মিশরীয় নীতিমালার সাথে ফ্রান্সের নীতিমালা মিশিয়ে ইসলামিক মিশরীয় পরিচয়কে বদলে ফেলার প্রয়াসও ব্যহত হয়। বোনাপার্ট দাবি করেছিল, মামলুকদের হাত থেকে মিশরকে বাঁচাতে ফ্রান্সের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এমনকি তাদের উদ্দেশ্য ভালো—মিশরীয়দের এমনটা বুঝানোর জন্য ফ্রেঞ্চ প্রচারকদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এসব ছলনা আল-আজহারের আলেমদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বিভ্রান্ত করতে পারেনি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মোহাম্মদ কুরায়িমকেও। কুরায়িম ফ্রেঞ্চ প্রচারণার বিরোধিতা করেছিল

আর এই কারণে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। তার অনুসারীরা পরবর্তীতে জনগণকে ফ্রেঞ্চ প্রচারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, উপনিবেশের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ওমার মাকরাম, শাইখ আল-সাদাত, কুওয়াইসনি এবং আব্দুল্লাহ আল-শারকাওয়ী। আশ্চর্যজনকভাবে কয়েকজন লেখক এবং ঐতিহাসিকদের সমর্থনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মিশরের বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ প্রচারণার সুবর্ণ শতবার্ষিকী পালন করতে চেয়েছিল। তারা দাবি করছিল, ঐ প্রচারণা দেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতীক।

জামালউদ্দিন আল-আফগানি (১৮৩৮-১৮৯৭) এমন এক সময় ইসলামি জাগরণ নিয়ে আসেন, যখন চারদিকে ইসলামি খিলাফত ধ্বংসের চেষ্টা চলছিল। অনেকে তার বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে তার দক্ষতা ছিল, ধর্মীয় বিষয়গুলোতেও ভালো জ্ঞান ছিল। যেমন—ইসলামি আইনশাস্ত্রে, কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা বিষয়ে। রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন বিষয়েও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। অনেকে আফগানির সমালোচনা করে। কারণ, তিনি পশ্চিমা সভ্যতায় আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আমার মতে, তিনি কখনও তার ইসলামি বিশ্বাসকে আক্রান্ত হতে দেননি।

আল-মিনার ম্যাগাজিনের প্রকাশক মোহাম্মদ রাশিদ রেজাও (১৮৬৫-১৯৩৫) প্রাচীন ইসলামিক নীতিমালার সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইসলামি শরিয়াহর পরিবর্তে পশ্চিমা নিয়ম-নীতি মিশরে প্রবেশ করানোর বিরোধিতা করেন তিনি। ইসলামি খিলাফতের জন্য তিনি এমনটা করেছিলেন। তার *আল-খিলাফা আও আল-ইমামা আল-অলিয়া* (খিলাফত বা সুউচ্চ নেতৃত্ব) আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র বিষয়ে গবেষকদের জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলানোর জন্য ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের আধুনিক ব্যাখ্যা দিতে তিনি কাজ করে গেছেন। ইসলামি জাগরণের বেশিরভাগ প্রয়াস মিশর থেকেই শুরু হয়েছে। হাসান আল-বান্না [মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা, (১৯০৬-১৯৪৯)] বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসলামি পুনর্জাগরণের ডাক দেন।

সেসময় ইসলামি খিলাফত ধ্বংস হয়েছিল আর কামাল আতাতুর্ক এর শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ইসলামিক একতার আধুনিক ধরন সামনে নিয়ে আসেন। বান্না আল-মিনারের মোহাম্মদ রাশিদ রেজার লেখা দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলেন। মিশরের বুদ্ধিজীবীরা যখন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, বান্না তখন আসেন আলোকবর্তিকা হয়ে। তিনি ইসলামি ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচারণা চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কম সময়ের মধ্যেই মিশরীয় সমাজ এই মতাদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তিনি ইসমাইলিয়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। সেখান থেকে পরবর্তীতে কায়রোতে চলে আসেন এবং মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইয়িদ কুতুব জিহাদি ইসলামিস্টদের মতাদর্শ গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার অনুপ্রেরণায় জামাল আবদেল নাসেরের সময় থেকে সেক্যুলারিজম ও পশ্চিমাকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছে যুবকেরা। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শাইখ বাছাই পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে নাসের আল-আজহারে উন্নতির নামে নতুন কার্যক্রম শুরু করে। আগে নির্বাচনের মাধ্যমে আল-আজহারের প্রধান শাইখ নিযুক্ত করা হতো। পরে সরকারকর্তৃক নিযুক্তের নিয়ম চালু হয়। নাসের প্রধান শাইখের অর্থনৈতিক দিকেরও পরিবর্তন করে। পূর্বে ওয়াকফ থেকে শাইখকে অর্থ দেওয়া হতো। নাসের এর পরিবর্তে প্রশাসন থেকে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু করে। রাজনৈতিক অবদান কমে যাওয়ায় আল-আজহার তার পূর্বের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। এই পরিবর্তনগুলো আল-আজহারের রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ও মিশরের ইসলামি পরিচয় ধরে রাখার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগকে ধ্বংস করে দেয়। ১৯৬৭ সালের ব্যর্থতা রাজনৈতিক দমন-পীড়নের যুগের অবসান ঘটায়, যুবকদের নিজেদের পরিচয় খুঁজতে উৎসাহ দেয়। নাসের স্বৈরশাসনের যুগ শাসকদের বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের ইসলামি জাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ১৯৬৬ সালে জাওয়াহিরি গুপ্তদলে যোগ দেওয়ার সময় সেই সময় পুনরায় আসে। সেই দলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল জোর করে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। যেই জিহাদি ইসলামি আন্দোলনের

সূচনা সে করেছিল, সেটা হাজারও মুজাহিদের জন্ম দিয়েছিল। যেমন– কারিম আল-আনাদলি। সে জিহাদি ইসলামি চিন্তাধারা গঠনে ভূমিকা রেখেছিল।

আনোয়ার আল-সাদাত মুসলিম ব্রাদারহুডের কারাবন্দী সদস্যদের মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার এক ঝলক দেখিয়েছিল। এই স্বাধীনতা সমসাময়িক কয়েকজন ইসলামিস্ট নেতাকে বিভিন্ন ইসলামিক দল গঠনে সহযোগিতা করেছিল। সাদাত আর ইসলামিস্টদের মধ্যে মিটমাট-শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক কয়েক বছরে সংঘর্ষের সম্পর্কে নেমে আসে। ১৯৮১ সালের ৬ অক্টোবর খালিদ ইসলামবলি আর তার অনুসারী আব্দেল হামিদ আব্দেল সালাম, হুসাইন আব্বাস আর আতা তায়েল হামিদার হাতে সাদাত হত্যাকাণ্ড ঘটে।

মোহাম্মদ আব্দেল সালাম ফারাগ 'অস্তিত্বহীন দায়িত্ব' অর্থাৎ জিহাদের ধারণা পুনর্জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সাদাত হত্যার সময়ে সব ইসলামি দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা মিশরীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ করার সক্ষমতা লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়, সিন্ডিকেট, স্পোর্টিং ক্লাব আর দরিদ্র এলাকায় তাদের সুস্পষ্ট আনাগোনা ছিল। 'ইসলাম হুয়া আল-হাল' অর্থাৎ 'ইসলামই হচ্ছে উত্তর' স্লোগানই বলে দেয় সেটি ইসলামিস্টদের জন্য শক্তিশালী সময় ছিল।

'সভ্যতার সংঘাত' নিয়ে পশ্চিমে সব হৈ চৈ শুরু হয়, যখন লেখক রিচার্ড নিক্সন পাঠকদের সচেতন করতে পশ্চিমের প্রধান শত্রু ইসলাম সম্পর্কে লেখে। NATO এর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেলও একইভাবে সচেতন করে। আফগানিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' বলা জর্জ বুশের ভুল বলে ধরে নেওয়া কষ্টকর। এই শব্দটা তার গভীর উদ্দেশ্যের জানান দেয়। সেই সাথে এ-ও প্রকাশ করে–এই যুদ্ধ সুনিশ্চিত ক্রুসেড। ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার টনি ব্লিয়ার একই কথা বললে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামিক সমস্যাগুলোতে সমাজ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত বুদ্ধিজীবী হয়

ইসলামিক দলগুলোর সাথে যোগ দিতে হবে নয়তো তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। একইভাবে আমাদের সাথে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের সাথে আমাদের সহিষ্ণুতার প্রাচীন ঐতিহ্য ইতিহাসে লেখা থাকলেও আমরা একই বিশ্বাস লালন করি না। ফলে মতামতের ভিন্নতা হয়ে থাকে। এই বক্তব্যকে বিকৃত করা উচিত নয়। আমার উপলব্ধি ও বিশ্বাসকে সন্দেহ করার কিছু নেই। আমার বিশ্বাস ধর্মীয় ও আদর্শিক পছন্দের ওপর গড়ে উঠেছে। সেই সাথে এটি আমার রাজনৈতিক দর্শনও। এটি ধর্মীয় ও আদর্শিক উপযোগিতা, সেই সাথে পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশও। আইনের ক্ষেত্রে মিশরীয়রা ইসলামকে পছন্দ করেছে আর তারা তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করবে না। মানুষের সন্তুষ্টি মানবরচিত আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামিস্ট দলগুলোর নেতাদের আত্মসমালোচনার জায়গা রাখতে হবে। জামাআ আল-ইসলামিয়ার যুদ্ধবিরতি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করার সময় আমি যেই কথাটা বলেছিলাম, সেটা আবারও বলছি—“আত্মসমালোচনাকে হ্যাঁ বলুন, পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়াকে না বলুন।” এই লাইনটির সাথে অধিকাংশ মুসলিম স্কলার ঐকমত্য পোষণ করেন। এটি আমি যেই আন্দোলনের হয়ে কাজ করছিলাম, তার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল। আমি তাদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করছিলাম যারা ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছে, প্রকাশ্য পালন করছে এবং পরিষ্কারভাবে নিজের বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে।

বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব স্থানে থাকা আমাদের যেসব ভাই-সহকর্মীরা ইউরোপে আছেন, তারা বর্তমান বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাদের অনুসন্ধান করা উচিত, আমাদের কোন ভুলগুলো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। তাদের উচিত বর্তমান দলাদলি দূর করে ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করা। ক্রুসেডাররা উম্মাহর পরিচয় মিটিয়ে দিতে চায়, সে পরিচয় রক্ষা করার জন্য একতা প্রয়োজন। আলাদা-আলাদাভাবে একেকটি দল যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সফলতা অর্জনের জন্য তাদের ঐকবদ্ধ হওয়া

প্রয়োজন। কেবল একত্র হওয়ার মাধ্যমেই দলগুলো আক্রমণ রোধ করতে পারবে। যখন আমি ইউরোপে বসবাসরত ইসলামিস্টদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বললাম, তারা রাজি হলো। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই কিছু সময় অপেক্ষা করতে চান। তাদের ভাবছিলেন, তাদের প্রয়াসকেও জাওয়াহিরি আর বিন লাদেনের জোটের মতো মনে করা হবে।

* * *

ইসলামি সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে প্রথম মুসলিম নেতা ছিলেন সবার প্রিয়—নবি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার ছত্রছায়ায় মুসলিমরা মাত্র একবার পরাজিত হয়েছিল, যেদিন সৈনিকরা তাদের নেতার কথা অমান্য করেছিল—উহুদের যুদ্ধের দিনে। সেটি ছিল ইসলামের অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ একটি পরাজয়।

অনেক মুসলিম নেতা সেদিন মারা গিয়েছিল, আর গুজব রটেছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গিয়েছেন। হুনাইনের যুদ্ধে হাজারও মুসলিম সৈন্য আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা জয়ী হবে। যদিও তারা ভেবেছিল তারা পরাজিত হবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ তাদের যুদ্ধে বস্তুগত পুঁজির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাতে চেয়েছিলেন। বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি নিজে বিজয় আনতে পারে না। তাদের কাছে যতই অস্ত্র ও যোদ্ধা থাকুক না কেন, আল্লাহ মুসলিমদের তখনই বিজয় দেবেন, যখন তারা আল্লাহর পথ অনুসরণ করবে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মুসলিমরা অন্যান্য মানুষের মতোই কঠোর পরিশ্রম না করলে তারা পার্থিব শক্তি অর্জন করতে পারবে না। এই বাস্তবতা ইসলামের প্রথম যুগের একজন দলপতির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তখন ইসলামি সাম্রাজ্য দুর্দান্ত শক্তিশালী ছিল। যুদ্ধ শুরুর আগে তিনি সৈন্যদের সংক্ষেপে এটুকুই বলেছিলেন, "তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ধার্মিক হতে হবে। যদি

তোমরা তোমাদের শত্রুর মতোই পাপী হও, তাহলে শত্রুরা তাদের অস্ত্র দিয়ে তোমাদের শেষ করে দেবে।”

মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, পরাজিত হলেও তাদের মনে এই বিশ্বাস থাকে যে একদিন তারা বিজয়ী হবেই। তারা জানে, পরাজয় মুসলিমদের বিশ্বাসের সৌন্দর্য নষ্ট করে না। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

“যখন তোমাদের উপর একটি মসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।”[৮০]

আমরা যদি দেখি মুসলিম উম্মাহ সাময়িক সময়ের জন্য পরাজিত হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য তারা শীঘ্রই পুনরুজ্জীবিত হবে। একটি হার ভালো উন্নতি এনে দিতে পারে। প্রতিটি ফিরে আসা প্রমাণ করে মুসলিমরা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। তাদের পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করে শক্তি অর্জন করতে সক্ষম।

সুতরাং, আমাদের পরাজয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয়। কুরআন বলে—

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।”[৮১]

অপরদিকে, আমাদের সব প্রচেষ্টা আর সম্পদ এই কঠিন পরীক্ষা পার করার পেছনে ব্যয় করতে হবে। পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

---

৮০. কুরআন, আল-ইমরান (৩: ১৬৫)

৮১. কুরআন, আল-মায়িদাহ (৫: ৫৪)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত, সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।"[৮২]

পরিস্থিতিভেদে মুসলিম বাহিনীর কর্মপন্থা বদলাতে হবে, যেভাবে স্থান, সময়, পরিস্থিতি ও আলেমভেদে ফতোয়া বদলে যায়। দুর্বলতার সময় মুসলিমদের আস্তে আস্তে এগুতে হবে। তাদের ইসলামকে জীবনপদ্ধতি হিসেবে অবহেলা করা উচিত নয়, উচিত নয় এর কোনো ভিত্তিকে উপেক্ষা করা। বরং তাদের সেভাবে সংগ্রাম করা উচিত, যেভাবে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার আগে মক্কার দুর্বল অবস্থায় করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনার কাজকর্ম তার মক্কার কাজকর্ম থেকে ভিন্ন ছিল। একইভাবে মক্কা বিজয়ের আগে-পরেও আচরণের ভিন্নতা ছিল। মক্কা বিজয়ের আগে ইসলামের কোনো নির্দেশে ছাড় না দিয়েই তিনি হুদাইবিয়ার চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। খারাপ পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সাবধানে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যাতে এই সময়টায় ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।

"তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জালেম তাদের ওপরই পতিত হবে না। এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠোর।"[৮৩]

পরাজয় মুসলিমদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে, যেভাবে অন্যদের জন্য হয়। আর সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। পরাজয়ের বেদনা লাভের পর মুসলিমরা আঘাত করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। মুসলিমদের জন্য আরেকটি পথ হলো, জিহাদ ও কঠোর

---

৮২. কুরআন, আল-আনফাল (৮: ১৫-১৬)

৮৩. কুরআন, আল-আনফাল (৮: ২৫)

পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই ভুলগুলো সংশোধন করা, যেগুলো পরাজয়ের কারণ হয়। পরাজয় নৈতিক অবক্ষয় ও ধ্বংসযজ্ঞ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হতে পারে। যোগ্য নেতারা ব্যর্থ হলে পরাজয়ের কারণে অযোগ্য ব্যক্তিও নেতৃত্বের দায়িত্ব পেতে পারে। পরাজয় অন্যদের মতামত যাচাই-বাছাই করার মানসিকতাও নষ্ট করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে পরাজয় এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়। পরাজয়ে সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো হতে পারে এমন—

আল্লাহর সাথে দূরত্ব অনুভব করা

প্রথম লক্ষণ হলো, মানুষ আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়। আর অন্য কাউকে যুক্তি-তর্কে প্রতিহত করার জন্য শেষ পর্যন্ত শরিয়াহর নিয়ম-কানুন পালন করতে চায় না। যেকোনো বিবাদে মেনে চলার জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন বলে—

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।"[৮৪]

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।"[৮৫]

নবি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটো বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এগুলোকে আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সে বস্তু দুটো হলো কুরআন ও আমার সুন্নাহ।"

৮৪. কুরআন, আল-আনফাল (৮: ২৪)
৮৫. কুরআন, আন নিসা (৪: ৬৫)

নিজের মতামতের বিষয়ে ব্যক্তির প্রচণ্ড দম্ভ

এটি ধর্মের প্রতি অবহেলা কমার মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ আমার প্রতি নজর রাখছেন না—এ ধরনের মনোভাব থেকে আসতে পারে।

"তবে কি যিনি প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি কাজকর্মের পর্যবেক্ষক, তিনি ওদের ঐ অক্ষম উপাস্যগুলোর মতো?[৮৬]

একজন সম্মানীয় পূর্বপুরুষ বলেছেন, "আল্লাহর থেকে বেখেয়াল থেকো না। তিনি তোমার ওপর নজর রাখছেন।"

নিজেকে নজরদারির আওতামুক্ত মনে করার ফলাফল হলো, দৈনন্দিন জীবনে, বিচার-বিবেচনায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শরিয়াহকে প্রাধান্য না দেওয়া।"

এই অনুভূতির কারণে মানুষের মতামতকে সঠিক মনে করার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আল্লাহর সাথে দূরত্ব তৈরি হলে মানুষ ভিন্ন মতামতের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করতে চায় না। এ কারণে মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। অথচ ঐক্যই বিজয়ের মূল রাস্তা, সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে অনুপ্রেরণার উৎস।

পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও ভিন্নতা

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত থেকে শুরু করে মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আল্লাহ একটি বিষয়ই শিখিয়েছেন—ভালোবাসতে হবে আল্লাহর জন্য। শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি ছিল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং মুহাজির (যারা রাসূলের সাথে মদিনায় হিজরত করেছিলেন) ও আনসারদের (যেসব মদিনাবাসী মুহাজিরদের গ্রহণ করেছিলেন) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব। সবচেয়ে শক্তিশালী পর্যায় হলো, যখন দুজন একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে অথবা ঘৃণা করে। যখন কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দেয় বা

৮৬. কুরআন, আর রাদ (১৩: ৩৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিরোধ করে তখন সে বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। মানুষ তখনই বিজয় অর্জন করতে পারে, যখন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। ভালোবাসাই তাদের স্লোগান। এটি এমন অপরাজেয় তলোয়ার, যেটা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে। পূর্ব বা পশ্চিমের কোনো গোষ্ঠীই এই অস্ত্র দমন করতে পারবে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

"যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন।"[৮৭]

যারা জয়ী হবে তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, "যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে, তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।"

একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অভাবে ইসলামিক বিপ্লবের সমসাময়িক সৈন্যরা তাদের আসল উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হচ্ছে।

বিভিন্ন দলের মধ্যে ভিন্নতা

আমাদের একজন শাইখ বলেছেন, এটা ভালো যে দলের সংখ্যা অনেক। তার মতে, এটা ইসলামি বিপ্লবের জীবনীশক্তি। তিনি ইসলামকে একটি দালানের সাথে তুলনা করেন, যার বেশ কয়েকটি তলা আছে, অনেকগুলো জানালা আছে কিন্তু দরজা আছে মাত্র একটি। বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠী ও সংগঠন হচ্ছে তলা আর জানালার মতো। এই তুলনাটি সঠিক হতো যদি অসংখ্য ইসলামি দল তাদের সম্পদ ও শক্তি একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করত, সাথে তারা যদি মেনে নিত কার মতামত ঠিক সেটা প্রগতিই বলে দেয়—যেমনটা ইসলামের স্বর্ণযুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলেছিলেন। দলগুলোর ভিন্নতা এই আন্দোলনের পক্ষে ভালোই হতো যদি ভিন্ন মতামতকে গ্রহণ করা হতো, বিনয়ের সাথে মতানৈক্য মেনে নেওয়া হতো। দলগত ভিন্নতা ক্ষতির দিকে নিয়ে

৮৭. কুরআন, আল-আনফাল (৮: ৬৩)

যায় যখন দোষারোপ, মতানৈক্য দেখা দেয়, ভিন্নমত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না।

তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিটি ইসলামি দল কেবল নিজেদের কথাকেই ইসলামের বৈধ মত মনে করে, মনে করে একমাত্র তারাই ইসলামের পক্ষে কাজ করছে। অন্য দলগুলো মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য কাজ করে না।

নিয়ন্ত্রণহীন অপকর্ম আর পাপের বিষয়ে আমি পূর্বেই ইসলামের প্রথম যুগের একজন মহান নেতার বক্তব্য উল্লেখ করেছিলাম। তিনি তার সৈন্যদের বলেছিলেন, "তোমাকে আল্লাহর কাছে সৎ হতে হবে। কারণ, যদি তোমরা তোমাদের শত্রুর মতোই পাপী হও, তাহলে শত্রুরা তাদের অস্ত্র দিয়ে তোমাদের শেষ করে দেবে।" ইসলামি আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে পরাজিত হয়ে আসছে। তাই এর সদস্য, সৈন্য ও নেতা—সবারই আল্লাহর কাছে নিজেদের অপকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। কোনো কোনো অপকর্ম একজন ব্যক্তির দ্বারা ঘটতে পারে, তবে পুরো উম্মাহই হতে পারে এর ভুক্তভোগী। পরাজিত হওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। ছোট ছোট পাপকেও গণনার বাইরে রাখা উচিত নয়। কবি বলেছেন—

"ধার্মিক ব্যক্তি পাপের বিষয়ে অসতর্ক থাকে না—
হোক সেটা ছোট বা বড়।
ছোট ছোট নুড়ি দিয়েই তো পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।"

মুসলিম সুলতান কুতুজ মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী গঠন করার সময় বিখ্যাত আলেম ইবনে আব্দুল সালামকে জিহাদের ঘোষণা দিতে এবং জিহাদের পক্ষে সমর্থন ও সম্পদ আদায়ের জন্য বললেন। শাইখ ইবনে আব্দুল সালাম এই অনুরোধ আবেগ দিয়ে বিচার করলেন না। তিনি কুতুজকে পতিতালয় ও মদের দোকানগুলো বন্ধের আদেশ দিতে বললেন। এই ঘটনা শিক্ষা দেয়, ইসলাম ও আল্লাহর একত্ববাদের পতাকাবাহী যেকোনো দলের বিজয় অর্জনের জন্য বেশ কিছু গুণ থাকা

প্রয়োজন। আল্লাহ এমন দলের জন্য বিজয়ের ওয়াদা করেননি, যারা বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কুরআন বলে, বলুন, "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৮]

জালিয়াতি ও ইজতিহাদের কমতি

অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করলে ইসলামের সুন্দর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সবসময়ের জন্যই মানানসই। কুরআন সাধারণ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কোনো আয়াত নাজিলের কারণ অনুসন্ধান করলে উম্মাহ সেই নীতিমালাগুলো বুঝতে পারে। তাছাড়া সুন্নাহ আইন প্রণয়নের অন্যতম উৎস ও কুরআন বুঝার নির্দেশিকা। একটি পরাজিত প্রজন্মের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা, সাম্প্রতিক সময়ের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার না করা ভীষণ বিপজ্জনক বিষয়। ধর্মীয় নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন না করলে আল্লাহ আমাদের বিজ্ঞান শেখায় অনুমতি দেন। একটি পরাজিত জাতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কুরআন সুন্নাহর এমন ব্যাখ্যা মেনে চলে, যেটা বর্তমান সময়ের সাথে মেলে না। হয়তো সময়ের সাথে সেই ব্যাখ্যাটা বদলে গেছে। কিন্তু তারা আগের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করে নেয়। এর ফলে এমন ফতোয়া দেয়, অনেকে যেগুলো বাকি পৃথিবী থেকে আলাদা হতে বলে, মানবজাতির উপকারে আসে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করতেও নিষেধ করে। এমন পর্যায়ের ফতোয়াও আসে, যেগুলো শিক্ষা অর্জন করতে, সরকারি চাকরি করতেও নিষেধ করে। এই পরাজিত জাতি বেশিরভাগ সময়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। একজন কবি বলেছেন—

৮৮. কুরআন, আয-যুমার (৩৯: ৫৩)

"তারা আন্তারার[৮৯] মতো কথা বলে, কিন্তু কাজের সময় খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে যায়।"

পরাজয়ে ভেঙে পড়লে ফেইস ভ্যালুর ওপর নির্ভর করে কাজ করার প্রবণতা বাড়ে। হতাশা এমন স্লোগানের জন্ম দেয়, যেগুলোর কোনো ফলাফল নেই। আর প্রথম যুগের মুসলিমরা এমন বিষয়গুলো কীভাবে সামাল দিতেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার মানসিকতাও নষ্ট করে দেয়। ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ভালোই ঝাঁকুনি খেয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত করে দেওয়া তিনজন সেনাপ্রধানই এই যুদ্ধে শহিদ হন। খালিদ বিন ওয়ালিদ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেন, যদিও তাকে নিযুক্ত করে হয়নি। তিনি সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাকে নিয়ে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, তিনি কিন্তু সেসব কানে তোলেননি। তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইসলামি আন্দোলনের সদস্যদের উচিত, তাদের যেসব সহকর্মী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে রাজনৈতিক কর্মী ও মিডিয়ার সমালোচনার শিকার হয়, তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের ব্যথা উপশম করতে এগিয়ে যাওয়া। তারা এই আন্দোলনের হয়ে এমনসব কথা বলে যেগুলো বিপদগামী করে। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিষ্ঠাবান সদস্যদের উচিত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও গুরুত্বহীন বিষয় আলাদা করা। একই সাথে মহান ইসলামি ব্যবস্থা ও আধুনিক সভ্যতায় মুসলিম উম্মাহর বিচরণ ঘটানোও লক্ষ্যগুলোর একটি।

৮৯. বিখ্যাত আরব যোদ্ধা ও জননায়ক

টিকা

আমির: কোনো ইসলামি দলের নেতা।

আনসার: মদিনার অধিবাসী সেসব লোক যারা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর তাকে সাহায্য করেছিল।

ওয়াকফ: মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত বৃত্তি বা ভাতা।

আজহারি: মিশরের কায়রোতে অবস্থিত 'আল-আজহার' প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা সম্পন্ন করা ব্যক্তি। আল-আজহার একটি সুন্নি প্রতিষ্ঠান, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে।

খলিফা: বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতা।

খিলাফত: খলিফার নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমি।

দাওয়াহ: আক্ষরিক অর্থে কাউকে ডাকা বা আমন্ত্রণ জানানো। ধার্মিক মুসলিম কর্তৃক অন্য মুসলিমদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে আহ্বান করাকে দাওয়াহ বলা হয়।

ফতোয়া: কোনো আলেম (ইসলামিক স্কলার) কর্তৃক কোনো বিষয়ে জারিকৃত ধর্মীয় নির্দেশ।

ফিতনা: আক্ষরিক অর্থে 'কঠিন পরীক্ষা'। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে সংগঠিত আত্মবিরোধ বা অন্তঃকলহ অর্থেও ফিতনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে হয়েছিল।

ফিকহ: ইসলামিক আইনশাস্ত্র।

হাদিস: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদিস বলে। সুন্নি মুসলিমদের মতে, হাদিস ইসলামি শরিয়াহর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হজ: মুসলিমদের জন্য অত্যাবশকীয় তীর্থযাত্রা, যেটি মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়। সামর্থবান প্রত্যেক মুসলিমকে জীবনে অন্তত একবার হজ করতে হয়।

হালাল: যা ইসলামি আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।

হারাম: যা ইসলামি আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

হিজরত: আক্ষরিক অর্থ 'দেশান্তর হওয়া'। ইসলামি পরিভাষায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসাকে হিজরত বলা হয়। সাধারণত মুসলিমের অমুসলিম সম্প্রদায় আচ্ছাদিত এলাকা ত্যাগ করাকেও হিজরত বলে।

ইজতিহাদ: জ্ঞানের উৎস পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজ থেকে মতামত দেওয়া।

ইসলামিক: যা ইসলাম ধর্মের সাথে যুক্ত।

ইসলামিস্ট: সাধারণ বা রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে ইসলামের নিয়মকানুনের প্রচার-প্রসারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

জিহাদ: আক্ষরিক অর্থে সংগ্রাম বা যুদ্ধ। অন্যায় এবং ইসলামের জন্য হুমকি—এমন কিছুর বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগ্রাম বা যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।

জিহাদি: এমন বস্তু যা জিহাদের কাজে সহায়তা করে বা জিহাদের গুরুত্ব প্রচার করে। এই বইয়ে জিহাদি শব্দের মাধ্যমে যারা ইসলামিক লক্ষ্য অর্জনে সরাসরি যুদ্ধের সাথে যুক্ত তাদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুহাজিরিন: দেশান্তরী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা মক্কা থেকে মদিনায় এসেছিল তাদেরকে মুহাজিরিন বলা হয়। এছাড়া আরবসহ বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আফগানিস্তানে জিহাদে অংশ নিতে এসেছে তাদেরকেও মুহাজিরিন বলা হয়।

মুজাহিদিন: যারা জিহাদ করে। এই বইয়ে আফগানিস্তানে যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের বুঝাতে মুজাহিদিন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ওমরা: গৌণ তীর্থযাত্রা।

রিদ্দা: আক্ষরিক অর্থ 'মুখ ফেরানো' বা 'সরে আসা'। ইসলামি পরিভাষায়, ইসলাম ছেড়ে অন্য বিশ্বাস গ্রহণ করা বা ইসলামের কোনো মতবাদ ত্যাগ করা।

শরিয়াহ: আক্ষরিক অর্থ পথ বা রাস্তা। পরিভাষায়, এমন একটি নির্দেশনা যা মেনে চললে মুসলিমরা শান্তিতে থাকবে।

শুরা কাউন্সিল: ইসলামিক সংগঠন বা প্রশাসনের উচ্চস্থানীয় একটি দল, যারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

সুন্নাহ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অভ্যাস ও আচার-আচরণ।

সুন্নি মুসলিম: সেই ধরনের মুসলিম, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে ইসলামিক শরিয়াহর বুঝ গ্রহণ করে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলিমই সুন্নি।

উম্মাহ: ইসলামিক সম্প্রদায়; বৃহত্তর মুসলিম সমাজ। মূলত উম্মাহ বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী জাতিকে বুঝায়।

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বইসমূহ

বিশ্ব রাজনীতি

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	কয়েদী ৩৪৫ | গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর	সামী আলহায	২৩৫৳
২	আফিয়া সিদ্দিকী | গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
৩	কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬৳
৪	আয়না | কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি	আফজাল গুরু	৩২০৳
৫	আজাদির লড়াই | কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
৬	উইঘুরের কান্না	মহসিন আব্দুল্লাহ	২৬৪৳
৭	অ্যাম্বাসেডর	আব্দুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
৮	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
৯	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চোধুরী	৩০০৳
১০	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরণ	২৫০৳
১১	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
১২	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
১৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
১৪	নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
১৫	মাইন্ড ওয়ার	ম্যারি জোন্স ও ল্যারি	৩৩০৳
১৬	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩৩০৳
১৭	পাকিস্তান ইনসাইট	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৮	ইলুমিনাতি এজেন্ডা ২১	ডীন ও জীল হ্যান্ডারসন	
১৯	এনিমি কমব্যাটান্ট	মোয়াজ্জেম বেগ	
২০	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস.এম. মুশরিফ	৫০০৳
২১	দিদি | মমতা ব্যানার্জীর না বলা কথা	সুতপা পাল	
২২	পেট্রোডলার ওয়ারফেয়ার	উইলিয়াম ক্লার্ক	
২৩	বাউন্ডিং দ্য গ্লোবাল ওয়ার অন টেররিজম	জেফরি রেকর্ড	
২৪	ডিরেক্টরেট এস	স্টিভ কোল	

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	না বলতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
২	এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু সে	ফিল এম. জোনস	২০০৳
৩	সফল উদ্যোক্তা	সুব্রত বাগচী	৪০০৳
৪	ছোট অভ্যাস বড় সাফল্য	জেমস ক্লিয়ার	৩৫০৳
৫	এটিচিউড ইজ এভরিথিং	জেফ কেলার	৩০০৳
৬	বেঁচে থাকতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
৭	সুখী ও সুন্দর জীবনের ফরমুলা	নিক ভুইয়িচিচ	৪৫০৳
৮	এক্স্যাক্টলি হোয়্যার টু স্টার্ট	ফিল এম. জোনস	২৮০৳

ফিকশন

১	ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ	ক্যারিন স্লাথার	১৮০৳
২	গুজবাম্পস	আর.এল.স্টাইন	২০০৳
৩	ইন এনিমি হ্যান্ডস	মৈনাক ধর	১০০৳
৪	দ্য আনপ্রোডিগাল	মনু ধাওয়ান	২৫০৳
৫	শিকার	সৌরভ মুখার্জী	২৫০৳
৬	সবারই গল্প আছে	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳

অন্যান্য

১	লেখালেখির ১০১ অনুশীলন	মেলিসা ডোনাভান	৩০০৳
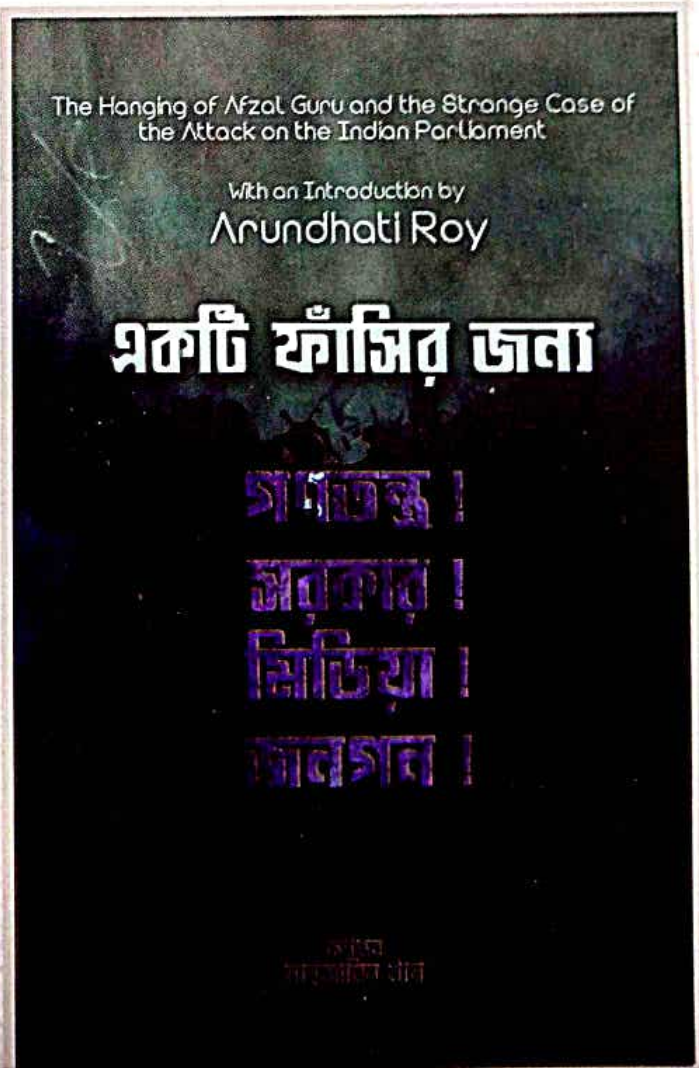
আয়মান আল-জাওয়াহিরি বর্তমানে মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিদের একজন। যার মাথার মূল্য ২৫ মিলিয়ন ডলার। ওসামা বিন লাদেনের পর তিনি আল-কায়েদার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিছু বিশেষজ্ঞ তাকে আল-কায়েদার মস্তিষ্ক বলে মনে করেন। অথচ তার সম্পর্কে জানার জন্য উল্লেখযোগ্য বইপত্র নেই বললেই চলে। এই না থাকার শূন্যতাটা অনেকাংশে পূরণ করে "দ্য রোড টু আল-কায়েদা" বইটি। মিশরীয় আইনজীবি মুনতাসির আল-যায়াতের লেখা এই বইটি শুধু আয়মান আল-জাওয়াহিরির জীবনের পর্যালোচনাই নয়, আল-কায়েদা এবং বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনের আলোচনাও বটে। এছাড়া লেখক মিশরের ইসলামি দলগুলোর আলোচনাও এনেছেন ব্যাপকভাবে। কারণ বৈশ্বিক জিহাদি আন্দোলনে মিশরীয় ইসলামি আন্দোলনেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। তো বলা যায়, সম্ভ্রান্ত এক মিশরীয় তরুণের একবিংশ শতাব্দীর অবিস্মরণীয় হামলার পেছনের কারিগর হওয়ার গল্প— "দ্য রোড টু আল-কায়েদা"।

BDT ৳ 330
USD $ 20

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94392-9-5